হতাশ প্রেমিক

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

পৌষ, ১৩৩০

মূল্য ১৷৷০

সূচী

হতাশ প্রেমিক

(ডায়েরী)

৩১শে চৈত্র। রাত্রি ১০টা।

হে ১৩২৮ সাল! আজ কি সত্য সত্যই তুমি আমাদের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছ? আজ নিশাশেষে, উষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যই কি তুমি অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইবে? তোমার পায়ে ধরি ২৮ সাল, এত শীঘ্র তুমি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আরও কিছুদিন অবস্থিতি কর—তোমায় যে আমি বুক ভরিয়া ভোগ করিতে পাইলাম না। ভাই ২৮ সাল, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই তোমার আসন্ন বিরহে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। তুমি আমাকে সুখ দাও নাই, দুঃখ দিয়াছ, তবু আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আসিবার কিছুদিন পরেই আমি আই-এ পরীক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু যথাসময়ে গেজেটে নির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক নামটি খুঁজিয়া পাই নাই বলিয়াই যে আমার দুঃখ, তাহা তুমি মনে করিও না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হওয়াকে

আমি দুঃখ বলিয়াই গণ্য করি না। এ বৎসর ফেল হইয়াছি, আগামী বৎসর পাশ করিব। কিন্তু ভাই ২৮ সাল! অপূর্ব একটি বিষয়ে যে ফেল তুমি আমায় করাইয়া দিয়াছ, ইহজীবনে তাহা ত আর কখনও সংশোধিত হইবার নহে! যাহাকে হারাইলাম, এ জীবনে তাহাকে ত আর পাইব না। তুমি আমার জীবনের সকল আলো সকল গান, সকল আশা সকল উৎসাহ হরণ করিয়া লইয়াছ তবু তোমায় ভালবাসি। ভালবাসার ধর্ম্মই বুঝি এই!

ভাই ১৩২৮ সাল! তুমি যেদিন প্রথম আসিয়াছিলে, সেই শুভ বৈশাখের প্রথম প্রভাতে যখন তুমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সেদিন তুমি আমাকে কি দেখিয়াছিলে, আর আজ তুমি আমাকে কি দেখিয়া যাইতেছ! সেদিন আমি ছিলাম দুঃখক্লেশ-শূন্য, চিন্তালেশ শূন্য নব্য যুবক, হৃদয়াকাশ মেঘহীন, সুখ-রবির কিরণ-সম্পাতে সমুজ্জ্বল; আর আজ? চিন্তা আমার প্রিয় সহচরী, দুঃখ-ক্লেশ আমার অন্নপান, সুখরবি চির অস্তমিত, হৃদয়াকাশ ঘনঘোর মেঘে সমাচ্ছন্ন, দশদিক অন্ধকার—অন্ধকার!

মনে আছে ভাই সেই ১২ই আষাঢ়? ঐ তারিখে শৈলকে আমি শেষ দেখিয়াছি। ইহার কয়দিন পরেই সেই চিঠি-বিভ্রাট; শৈলর পিতা আমাদের পাড়া হইতে পার্শীবাগানে উঠিয়া গেলেন। সেই শেষ দেখার ১২ই আষাঢ় তারিখটি আমার বুকে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। আর লেখা আছে, বিলাতফেরত ইঞ্জিনিয়ার প্রবোধ গুপ্তের সহিত তাহার বিবাহের তারিখ—২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮—ইহা আগুনের অক্ষরে আমার হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে

লিখিত হইয়া দিবারাত্র আমায় দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং হে ১৩২৮ সাল, তোমায় আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

কিন্তু দোহাই ভাই, তুমি ভুল করিও না। তোমার উপর আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব নাই। সে ভাব থাকিলে কি তোমায় আমি এতখানি ভালবাসিতে পারিতাম?

কেন তোমায় ভালবাসিয়াছি, তাহাও বলি। ভালবাসিয়াছি, কারণ কাব্যাদি পড়িয়া এখন আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি, লোকে যাহাকে পাওয়া বলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে হারাণো;—এবং যাহাকে না পাওয়া বলে, তাহাই যথার্থ পাওয়া। সেই ২২শে অগ্রহায়ণ, শ্যামবাজারের প্রবোধ গুপ্তের পরিবর্ত্তে যদি আমার সঙ্গে শৈলজার বিবাহ হইত, তবে সেই হইত তাহাকে আমার না পাওয়া। সে এখন আমার বধূ হইত বটে, কিন্তু কালক্রমে আমার পুত্রকন্যার জননী হইত, এবং আমার গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাসময়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইত। কিন্তু তাহাকে পাই নাই বলিয়াই সে আমার হৃদয়মন্দিরে স্থিরযৌবনা চির-বধূ—প্রেম প্রতিমার ন্যায় বিরাজ করিবে। এই ত যথার্থ পাওয়া। তাই বলিতেছিলাম, আমি তাহাকে না পাইয়াই যথার্থ পাইয়াছি; এবং প্রবোধ গুপ্ত তাহাকে পাইয়া সম্যক্‌রূপেই হারাইয়াছে।

ভাই ১৩২৮ সাল, নিতান্তই কি তুমি যাইবে? আমার এই ব্যাকুল প্রার্থনায়, আরও কিছুদিন—অন্ততঃ দুইটা দিন,—একটা দিনও কি থাকিতে পারিবে না? অহো স্মরণ হইয়াছে, বিধিলিপি আমাদের যেমন অলঙ্ঘনীয়, তেমনই তোমাদেরও

পঞ্জিকালিপি লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই—তোমায় যাইতেই হইবে।

তবে যাও ১৩২৮ সাল, সেই অনন্তধামে যাত্রা কর। তোমার স্মৃতিরক্ষাকল্পে "বর্ষ-বিদায়" নামক একটি কবিতা আমি আজ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও শেষ করিতে পারি নাই। আর শেষ করিয়া কোনও ফলও নাই, কারণ কোনও ভাল মাসিকপত্রে আর তাহা ছাপা হইবার উপায় নাই, কেন না সেগুলি আগামীকল্য ১লা বৈশাখ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বারান্দা আলোকিত করিবে।

১লা বৈশাখ, ১৩২৯।

স্বাগত হে নববর্ষ, তোমায় প্রণাম করি। লোকে বলে মুখ মনের দর্পণ স্বরূপ, কিন্তু তোমার মুখ দেখিয়া তোমার মনে কি আছে আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রভাতের সোণালি রৌদ্রে তুমি মুচকি মুচকি হাসিতেছ। আমার জন্য সুখ আনিয়াছ কি দুঃখ আনিয়াছ তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার এই সরল হাসি দেখিয়া, তোমাকে মন্দলোক বলিয়া আমার মনে হইতেছে না।

আজ প্রায় দশ মাসকাল তাহাকে দেখি নাই, তবু বাঁচিয়া আছি। আমার সে, অন্যের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে, তবু আমি বাঁচিয়া আছি। শৈল আমার বাল্যসখী; তাহারা আমাদের পাড়াতেই থাকিত। এক সময় ছিল, যখন আমি প্রায় প্রত্যহ তাহাদের বাড়ী যাইতাম; তাহাকে পড়া বলিয়া দিতাম, তাহার খেলায় যোগদান

করিতাম। সেও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসিত। তার পর শৈল বড় হইল। তাহার মা তাহাকে আমাদের বাড়ীতে আর আসিতে দিত না ; তাহাদের বাড়ী গেলে আমিও আর বড় একটা তাহার সাক্ষাৎ পাইতাম না। এই সময় বাবা ঢাকায় বদলি হইলেন ; বাড়ীটা ভাড়া দিয়া আমরা ঢাকায় গিয়া প্রায় তিন বৎসর রহিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া শুনি, সে ইস্কুলের গাড়ীতে উঠিয়া পড়িতে যায়। গাড়ী হইতে ওঠা নামার কালে মাঝে মাঝে তাহার সহিত আমার চোখোচোখি হইতে লাগিল। যে ছিল কিশোরী, সে এখন নব যুবতী ; আমার হৃদয় নিহিত সে বাল্যস্নেহ, উদ্দাম প্রণয়ে পরিণত হইল। হৃদয়ের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইস্কুলের ঠিকানায় তাহাকে আমি চিঠি লিখিলাম। তখন জানিতাম না, মেয়েদের নামে চিঠি আসিলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী প্রথমে তাহা খুলিয়া পাঠ করেন। ফলে, চিঠি শৈলর কাছে না পৌছিয়া তাহার বাবার কাছে আসিয়া পৌছিল। তাহার বাবা আমার বাবাকে উহা দেখাইলেন। বাবার নিকট কাণমলা ও মার নিকট গালি খাইলাম ;—কয়েকদিন পরে অন্য বাড়ী ভাড়া লইয়া শৈলর পিতা পার্শীবাগানে উঠিয়া গেলেন। বিলাতফেরত প্রবোধ গুপ্তের সঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসে শৈলর বিবাহ হইল, সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম। আমার হৃদয় শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল।

১৭ই শ্রাবণ। বেলা ৯টা।

গত রাত্রে তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যেন একখানি

কল্কাপাড় শাড়ী পরিয়া, পুস্তক ও খাতা হস্তে কলেজের গাড়ী হইতে নামিয়া, জুতা খুট খুট করিতে করিতে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল ; প্রবেশের পূর্ব্বে একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, চকিতের ন্যায় একটু হাসিয়া গেল। ইহা পার্শীবাগানে কি শ্যামবাজারে, স্বপ্নে তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়া অবধি, জাগ্রতে তাহাকে একটিবার দেখিবার জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। কিন্তু সে এখন পরস্ত্রী, প্রেমনয়নে তাহাকে দেখা কি এখন আর আমার উচিত? আবার ইহাও মনে হইতেছে, শুধু একটিবার চোখের দেখা বৈ ত নয়, তাহাতে দোষ কি ? এখন উঠি, কলেজের বেলা হইল।

১৯শে শ্রাবণ, রাত্রি ১০টা।

খবর লইয়া জানিয়াছি, শৈল এখন তাহার স্বামিগৃহে—শ্যাম-বাজারে। বাড়ীটাও সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি। বাড়ীর প্রায় সম্মুখে একটা চায়ের দোকান আছে ; বেলা সাড়ে তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত আজ সেখানে বসিয়া পাঁচ ছয় পেয়ালা চা পান করিলাম ; কিন্তু ইস্কুলের গাড়ীও সে রাস্তায় আসিল না, তাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

৯ই ভাদ্র।

হে আমার লাল রঙের নূতন ষ্টাইলো পেন, আজ তোমায় কেন কিনিয়া আনিয়া তোমার বুকে লালকালী ভরিয়াছি, তাহা তুমি জান

হতাশ প্রেমিক

কি ? উপরের ঐ তারিখটি লিখিবার জন্য। ঐ তারিখটি আমার জীবনে একটি লাল অক্ষরের তারিখ (red letter day)—আজ আমি তাহাকে দেখিয়াছি—প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াছি। রাত্রি ৯টার সময় বায়স্কোপ হইতে বাহির হইয়া, ট্রামের জন্য গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময় দক্ষিণ দিক হইতে আগত একখানি মোটর গাড়ীর প্রতি নজর পড়িল ; ভিড়ের জন্য থামিয়াছে এবং ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতেছে ; সেই গাড়ীতে ইংরাজী বেশে সজ্জিত প্রবোধ গুপ্তের পার্শ্বে বসিয়া—সে। পরিধানে একখানি নীলাম্বরী বেনারসী শাড়ী। গ্যাসলণ্ঠনের আলো তাহার সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়াছে ; সে মুখখানি যেন বড় গম্ভীর, যেন বড় বিষণ্ণ—একটু যেন বিরক্ত—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ বিবাহে সে সুখী হয় নাই। ভিড়ের জন্য প্রায় দুই মিনিট কাল গাড়ীখানি সেই খানেই আটকাইয়া রহিল, এবং আমি প্রাণ ভরিয়া, নয়ন ভরিয়া তাহার রূপসুধা পান করিলাম। অবশেষে ভিড় কমিলে গাড়ীখানি শ্যামবাজারের দিকে চলিয়া গেল ; আমিও বউবাজার-গামী ট্রামে লাফাইয়া উঠিলাম। সারাপথ মনে মনে বলিতে লাগিলাম—ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অভাগার, কার ধন কারে দিলি সে আমার হল না ?

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। এইবার আলো নিবাইয়া শয়ন করি। হে আমার মানসী প্রিয়া, আজ স্বপ্নে আমায় একটিবার দেখা দিও—আমার সহিত দুটি কথা কহিও। আমি বড় দুঃখী।

১৩ই আশ্বিন। মধুপুর।

তাহার দর্শন-মধুলুব্ধ হইয়া আজ মধুপুরে আসিয়াছি। সমস্ত পূজার ছুটি প্রবোধ গুপ্ত এই খানেই যাপন করিবে। তাহার বাঙ্গলাটি কোথায়, আজ বিকালে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রতিদিন সে শৈলকে লইয়া নিশ্চয়ই বেড়াইতে বাহির হইবে; প্রতিদিন তাহাকে দেখিব। লাল ষ্টাইলোটিও সঙ্গে আনিয়াছি।

১৬ই আশ্বিন। রাত্রি ৯টা।

তিনদিন বৃথা অন্বেষণের পর, আজ তাহার দর্শন পাইয়াছি। প্রবোধের সঙ্গে সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু চকিতের ন্যায় দেখা—আমরা বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিলাম—সন্ধ্যাও আসন্ন হইয়াছিল। পরস্পরকে অতিক্রম করিতে যে সময়টুকু লাগে—সেইটুকু সময় মাত্র দেখা। তপ্ত সাহারার বুকের উপর একটি বিন্দুমাত্র বারি পতন।

১৭ই আশ্বিন। সন্ধ্যা।

আজও তাহাকে দেখিলাম, স্বামীর সহিত বেড়াইতেছে।

১৮ই আশ্বিন সন্ধ্যা		ঐ	ঐ
১৯শে	ঐ	ঐ	ঐ
২০শে	ঐ	ঐ	ঐ

হতাশ প্রেমিক

২১শে আশ্বিন।

রোজ রোজ আর ঐ ঐ লিখিতে ভাল লাগে না। কতক্ষণের জন্যই বা দেখা, সিকি মিনিটও নহে! আজ আমার ইচ্ছা হইতেছে, খোট্টা সাজিয়া উহাদের বাড়ী গিয়া চাকরি প্রার্থনা করি। যদি রাখে, তবে সারাদিন তাহাকে মনের সাধে দেখিতে পাই। কিন্তু হিন্দী যে জানি না; আর চেহারাটাও যে আমার আদপেই কাটখোট্টা নহে!

২২শে আশ্বিন।

বায়ুভোজী বাবুরা চাঁদা করিয়া এখানে পূজা করিতেছেন। কলিকাতা হইতে কারিগর আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ প্রায় সমাধা করিয়াছে। আমি ৫৲ চাঁদা দিয়াছি, এবং কাযকর্ম্মও অনেক করেতেছি। চাঁদার তালিকায় দেখিলাম, মিষ্টার ও মিসেস গুপ্ত ২০৲ চাঁদা দিয়াছেন। নিমন্ত্রণ পত্রে ঠিকানা লেখার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। মিষ্টার ও মিসেস্ গুপ্তের নামে দুই খানি স্বতন্ত্র খাম লিখিয়াছি। প্রবোধ বাবুর খামের মধ্যে কেবল ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র; শৈলজার খামের মধ্যে নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে একটি ক্রোড়পত্র—তাহাতে প্রাণের আবেগে অনেক কথা লিখিয়া ফেলিয়াছি। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে সেই বেশে সেই যে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। শেষে লিখিয়াছি, "জানি না, তুমি আজিও আমায় মনে কর কি না। আমাদের সে বাল্য-প্রণয় যদি আজিও তোমার মনে থাকে, তবে সেইটুকু তুমি আমায় জানাইও। সেইটুকুই আমি কেবল জানিতে চাহি—এজীবনে

তোমার কাছে আমি আর কিছুরই প্রার্থী নহি। যদি তোমার হৃদয়ের এক কোণেও আমার জন্য একটু স্থান থাকে, তবে বিজয়া দশমীর দিন বিকালে তুমি যখন ভাসান দেখিতে যাইবে, তখন তোমার সেই নীলাম্বরী বারাণসী শাড়ীখানি পরিয়া যাইও। যদি আমায় ভুলিয়া থাক, অথবা আমার প্রতি বিরূপ হইয়া থাক, তবে অন্য কোনও শাড়ী পরিও।"

২৩শে আশ্বিন।

উভয় পত্র পকেটে লইয়া স্বয়ং পত্রবাহক হইয়া, আজ বেলা ৯টার সময় আমি প্রবোধ গুপ্তের বাঙ্গালায় গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ শৈলজাকে তাহাদের ফুলবাগানে একা বেড়াইতে দেখিলাম। ফটক খুলিয়া, সাহসে ভর করিয়া, আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইলাম, এবং পত্র তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, "এই খানি তোমার—আপনার। আর এই খানি তোমার স্বা—স্বা—স্বামীর জন্যে।"—পত্র দিয়া প্রস্থান করিতেছিলাম। শৈল আমার মুখপানে চাহিতে আমি দাঁড়াইলাম। সে নিম্নস্বরে বলিল, "চলুন, বসবেন। তিনি এখনই বাড়ী ফিরবেন।" আমি বলিলাম, "না, আজ না, আমার অনেক কায আছে। তোমার চিঠিখানি তুমি নিজে খুলে দেখো। আমি যাই।" বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। ফটকের নিকট পৌঁছিয়া, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, খামখানি সে খুলিয়াছে; লাল নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে আমার লেখা সাদা কাগজখানি স্পষ্ট দেখিতে

পাইলাম। একটা কার্য্য ত করিয়া বসিলাম—জানি না ইহার ফল এখন কিরূপ হইবে।

২৮শে আশ্বিন। বিজয়াদশমী। রাত্রি ১১টা।

উঃ, ভয়ানক সিদ্ধি খাইয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই খাইয়াছি, কারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। বিষম নেশা হইয়াছে। উঃ, চোখে ভাল দেখিতে পাইতেছি না; লিখিতে পারিতেছি না! হাত কাঁপিতেছে। তবু একটা কথা আজ লিখিয়া রাখিতেই হইবে। সে আজ নীলাম্বরী বারাণসী শাড়ী পরিয়াই প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়াছিল। উঃ, শোয়া যাক।

২৯শে আশ্বিন। রাত্রি ১০টা।

এ কি হইল! আজ বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া, এ পথে সে পথে কোন পথেই তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। এরূপ অবশ্য পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে; প্রত্যেক দিনই যে উহারা বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে। তথাপি মনটা কেমন চঞ্চল হইল। ফিরিবার সময় উহাদের বাঙ্গলার নিকট দিয়া আসিলাম। দেখিলাম কোনও ঘরে আলো জ্বলিতেছে না। এই সময় মালী ফটকের নিকট আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সাহেব ও মেম সাহেব বেলা দ্বিপ্রহের ট্রেণে 'কলকত্তা' ফিরিয়া গিয়াছেন।

সহসা এ বজ্রাঘাত কেন? বিনা মেঘে? না মেঘ উঠিয়াছিল? প্রবোধ গুপ্ত কি কিছু জানিতে পারিয়াছে? শৈল হয়ত অসাবধানে আমার চিঠিখানা কোথাও ফেলিয়া রাখিয়াছিল, প্রবোধ তাহা

গোপনে দেখিয়াছে। হয়ত সে অপেক্ষা করিতেছিল, দেখি এ আজ কোন্ শাড়ী পরিয়া বেড়াইতে বাহির হয়। নীলাম্বরী বারাণসী দেখিয়া সে বুঝিয়াছে—সে নিজে চন্দ্রশেখরের সজীব সংস্করণ মাত্র। আমার বড় ইচ্ছা করে শৈলজার সঙ্গে আমিও এক চন্দ্রালোকিত রজনীতে অগাধ জলে একবার সাঁতার দিই—এবং তাহাকে শৈ— বলিয়া ডাকি। কিন্তু সাঁতার যে জানি না!

এতক্ষণ তাহারা কলিকাতায় আহারাদিও শেষ করিয়াছে। প্রবোধ না জানি শৈলকে কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা, কত তিরস্কার করিতেছে। শৈল কি উত্তর করিতেছে? সে কি বলিতেছে—আমরা এক বোঁটায় দুটি ফুল ফুটিয়াছিলাম, তুমি ছিঁড়িয়া পৃথক করিলে কেন?"

৪ঠা কার্ত্তিক।

আজ তিন দিন কলিকাতায় ফিরিয়াছি, তিন দিনই শ্যামবাজারে গিয়া শৈলদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথে ঘোরাঘুরি করিয়াছি, যদি কোনও সুযোগে একটিবার তাহার মুখখানি দেখিতে পাই। কিন্তু পাই নাই। প্রবোধ গুপ্ত মোটরে বাহির হইতেছে দেখিয়াছি, কিন্তু সঙ্গে শৈল নাই। তাহাকে বোধ হয় সে একটা অন্ধকার ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছে—বোধ হয় অশেষ প্রকারে কষ্ট দিতেছে। হয় ত এই অপমানে শৈল নিজ প্রাণ নষ্ট করিতেও পারে। উঃ কি ভয়ানক।—তাহাই যদি হয়? নৃশংস জানোয়ার প্রবোধ গুপ্তকে আমি তাহা হইলে গুলি করিব।

৯ই অগ্রহায়ণ।

আজ বিকালে ৪টার সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম। দ্বিতলে একটি জানালায় তাহার মুখখানি দেখিলাম। চারিচক্ষে মিলন হইবামাত্র জানালাটি সে বন্ধ করিয়া দিল। ভয়ে—সন্দেহ নাই; বাড়ীর কে কোথা হইতে দেখিবে, আবার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সুরু হইবে। চোখ দুটি তার বড় ম্লান দেখিলাম—বড় মনের কষ্টে আছে। হায় শৈলজা, কেন তুমি আমার হইলে না প্রিয়তমে?

৭ই অগ্রহায়ণ।

কলেজ পলাইয়া দ্বিপ্রহরে, বিকালে, সন্ধ্যায় আরও কয়েকদিন সেই রাস্তায় ঘুরিয়াছি, কিন্তু আর তাহার দেখা পাই নাই। কিন্তু একটা ফন্দি করিয়াছি। সেই বাড়ীর একজন ঝির সঙ্গে আলাপ করিয়াছি—তাহার নিকট শৈলর সংবাদটা মাঝে মাঝে পাইতে পারিব। আজ যখন শৈলদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলাম, তখন দেখিল ম একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক সন্দেশের একটা ঠোঙ্গা হাতে করিয়া সেই দিকে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিলাম, - কারণ মধুপুরে তাহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ গলির সে অংশটা তখন নির্জ্জন ছিল। আমি সাহসে ভর করিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিলান, "হ্যাঁগা, তুমি কি প্রবোধ বাবুর বাড়ীর ঝি?"

সে বলিল, "হ্যাঁ, কেন বাবু?"

"তোমার নাম কি?"

ঝি একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমার নাম শুনে আপনি কি করবেন? আমার কাছে আপনার কি দরকার তাই বলুন।"

"তুমি আমায় আর কখনও দেখেছ?"

"দেখেছি বৈ কি। মধুপুরে দেখেছি, সেখান থেকে ফিরে এখানেও কতদিন দেখেছি—আপনি আমার মনিববাড়ীর সামনে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ান, দেখেছি বৈ কি!"—বলিয়া সে আমার প্রতি একটা বিশেষভাবে চাহিয়া হাসিল। বোধ হয় এইরূপ চাহনিকেই কবি ও ঔপন্যাসিকেরা 'কটাক্ষ' আখ্যা দিয়া থাকিবেন।

কি প্রয়োজনের কথা তাহাকে বলি ভাবিতেছি, এমন সময় ঝি তাড়াতাড়ি বলিল, "কি দরকার শীগ্‌গির বলুন; এখনই কে কোথা দিয়ে এসে পড়বে।"

আমি। দেখ ঝি, সে অনেক কথা; একটু নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে?

ঝি। নিরিবিলিতে? আচ্ছা, কাল বেলা ১২টার সময় আপনি এইখানে আসবেন।

আমি। এই গলির মোড় কি নিরিবিলি?

ঝি। দূর, তা কি বল্‌ছি? সেই সময় আমি মনিববাড়ী থেকে ছুটি পাই; ঘরে যাই। আপনাকে আমার ঘরে নিয়ে যাব।

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "সেই বেশ হবে ঝি। কাল ঠিক ১২টার সময় আমি এইখানে এসে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব।"

"বেশ। আসবেন।"—বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

সুতরাং স্থির করিয়াছি, আগামী কল্য কলেজ পলাইয়া, ঝির সহিত তাহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করিব এবং শৈলজার সমস্ত খবর শুনিব।

১৮ই অগ্রহায়ণ।

বেলা সাড়ে ১১টার সময় কলেজ হইতে বাহির হইয়া, শ্যাম বাজারের ট্রাম ধরিয়া, ১২টার মধ্যেই যথাস্থানে পৌছিয়া দেখি,গামছা ঢাকা এক থালা ভাত হাতে করিয়া ঝি আসিতেছে। নিকটে আসিয়া সে আমাকে চুপে চুপে বলিল, "সঙ্গে সঙ্গে আসবেন না ; একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসুন।" আমি সেই ভাবেই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এ রাস্তা সে রাস্তা এ গলি সে গলি ঘুরিয়া ক্রমে একটা খোলার ঘরের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, "আসুন।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম; উঠানে একটা পেয়ারা গাছের ছায়ায় বসিয়া এক বৃদ্ধ ভাত খাইতেছে ; চৌবাচ্চার কাছে বসিয়া দুইজন ঝি-শ্রেণীর স্ত্রীলোক বাসন মাজিতেছে ; বারান্দায় নেকড়া ঢাকা দিয়া কাহার শিশু সন্তান ঘুমাইতেছে। ঝি বাম হস্তে আঁচলে বাঁধা চাবি লইয়া একটা ঘরের তালা খুলিয়া, প্রবেশ করিয়া আমায় বলিল, "ভিতরে আসুন।"

প্রবেশ করিতেই, কেমন একটা ভাপসা গন্ধ আমার নাকে গেল। ঘরখানা ক্ষুদ্র ও অন্ধকার। মেঝেটা সিমেণ্ট করা হইলেও,

সাঁৎ সাঁৎ করিতেছে। এক দিকে একটা তক্তপোষে মাদুর পাতা রহিয়াছে, প্রান্ত ভাগে কতকটা বিছানা গুটানো; অন্যদিকে দেওয়ালের কাছে ইটের উপর একখানা তক্তা বসানো; তাহার উপর একটা বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং একটা আমকাঠের সিন্দুক পাশাপাশি রক্ষিত। একটা জানালা ছিল, ঝি সেটাকে বাম হস্তে খুলিয়া দিল, ঘরে একটু আলো হইল। পরে আমার দিকে ফিরিয়া বিনীতভাবে বলিল, "গরীবের এই ভাঙ্গা তক্তপোষে বস্‌তে বলতে পারি কি?" আমি বসিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাহাতেই বসিলাম; সেটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া উঠিল।

ঝি বাহিরে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিল, "পাণ সেজে দেবো কি?"

আমি বলিলাম, "না, থাক্।"

"কেন, আমার সাজা পাণ খেতে কোনও দোষ আছে? আমি যদি আপনাদের বাড়ীরই ঝি হতাম, পাণ সাজতাম না? কি ধরুন, আপনি যদি আমার মনিব বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, তারা পাণ দিত, খেতেন ত? সেও ত আমার সাজা পাণ। তবে শূদ্দুরের ঘরে নারায়ণ শিলে থাকলে, ব্রাহ্মণেরা প্রণাম করে না। স্থান মাহিত্র একটা আছে বৈকি!—আচ্ছা তবে সিগারেট খান।"

বলিলাম, "দরকার নেই, থাক্।"

"বাজে সিগারেট নয় বাবু, ভাল সিগারেট—কাঁচি মার্কা—আমি আপনার জন্যেই কিনে রেখেছি। ভদ্দরনোকেরা কাঁচি খায় তা কি

"আর আমি জানিনে?" বলিতে বলিতে সে কুলুঙ্গি হইতে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট পাড়িয়া আমার কাছে রাখিল।

আমি বলিলাম, "সত্যি আমি সিগারেট খাই নে। আচ্ছা, তুমি দুঃখিত হবে, একটা পাণই বরং সেজে দাও।"

ঝি পিতলের ডাবর লইয়া পাণ সাজিতে বসিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রবোধ বাবুর বাড়ীতে কতদিন আছ?"

"অনেক দিন।"

"কি কায করতে হয় সেখানে তোমায়?"

"বাবুর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত আমি দেশে বাবুদের বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে সব কাযই করতে হত। বাবুর বিয়ের পর, দেশ থেকে আমি এখানে এসেছি। এখানে আমি কেবল বউগিন্নীর ঘরের সব কায করি, আর তাঁকে আগলাই। অন্য সব কাযের জন্যে অন্য ঝি আছে। আপনার সঙ্গে আমাদের বউমায় আগে থেকে চেনাশুনো ছিল, নয় বাবু?"

ভাবিলাম, সর্ব্বদা কাছে থাকে, শৈল হয় ত কোনও দিন প্রসঙ্গক্রমে আমার কথা উল্লেখ করিয়াছে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "তা ছিল বৈ কি।"

ঝি বলিল, "ওঃ, বুঝেছি তা হলে।"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি বুঝেছ ঝি?"

ঝি প্রথমে একটু হাসিল। একটা এনামেলের ছোট পিরিচে দুইটি সাজা পাণ আমার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "খান।" অন্য

একটি পাণ আলগোছে নিজের মুখে ফেলিয়া, একটি টিনের কৌটা হাতে লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দোক্তা নেবেন?" আমি অসম্মতি জানাইলে, সে নিজে কিঞ্চিৎ দোক্তা খাইয়া বলিল, "তা, আমায় কি কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে নিরিবিলিতে দেখা করতে চেয়েছিলেন বাবু?"

আমি বলিলাম, "তোমাদের বউগিন্নীর খবর বার্ত্তা সব জানবার জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছিল, তাই তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার বাবু হঠাৎ মধুপুর থেকে চলে এলেন কেন? প্রথমে শুনেছিলাম, কালী পূজো অবধি থাকিবেন।"

ঝি মাটির দিকে চাহিয়া নীরবে হাসিল। বলিল, "সে আর আপনার শুনে কায নেই!"

"কেন ঝি, শুনে কায নেই কেন?"

ঝি মুখ তুলিয়া বিনীতভাবে বলিল, "আমি ধরুন, সে বাড়ীর ঝি; আমার কি উচিত ঘরের কথা প্রেকাশ করা? তা ছাড়া, যে কথা শুনে পিথিমীতে কারু কোন উপকার হবেনা, মনের আপসোস বাড়বে বৈ কমবে না, নেবা আগুন জলে উঠবে, সে কথা শুনে লাভ? ওসব এখন—আপনাদের—মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত।"

ঝির কথাগুলি মনে মনে আমি আলোচনা করিতে লাগিলাম। 'আপনাদের' শব্দটি সে ব্যবহার করিয়াছে; আমারও উচিত—এবং তাহারও উচিত—সে সব কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলা, ইহাই

ঝির উপদেশ। ঝিকে সেই কথাটা স্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিব কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি অবনতমুখে এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম, সহসা ঝির কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—"কেন মিছে মন খারাপ করেন বাবু? সে সব আশা ত্যাগ করুন।"—পরক্ষণেই আমার রক্তটা চন্ করিয়া গরম হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, ঝি কি মনে করিয়াছে, আমি ইতরজনোচিত কোনও "আশা" সফল করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহায়তা-প্রার্থী হইয়া এই খোলার ঘরে উপস্থিত হইয়াছি? আমি গর্ব্বভরে, একটু তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলাম, "তুমি ভুল বুঝো না ঝি, আমার মনে কোনও কুমৎলব নেই। আমি তাকে ভালবাসি, কিন্তু সে অতি পবিত্রভাবে। তার সঙ্গে, তার বিয়ের ৫।৬ মাস আগে থেকেই আমার দেখাশুনো বন্ধ আছে। তার কথা শোনবার জন্যে আমার মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছিল, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।"

ঝি বলিল, "আরে রাম রাম! আমিও সেভাবে বলিনি। শুধু এই বলেছি, যা হবার তা হয়ে গেছে, সে সব কথা ভেবে এখন আত্মাকে মিছে কষ্ট দেওয়া কেন? তা বেশ ত, আপনি কি জানতে চান জিজ্ঞাসা করুন, আমি যা জানি বলছি।"

কিন্তু আমার রাগটা তখনও পড়ে নাই। জিজ্ঞাসা করিবার কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলাম, "সে ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, এখন ভালই আছেন।"

"বেশ। তা হলে এখন উঠি"—বলিয়া আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম।

ঝি বলিল, "এখনি চল্লেন ?"

"হ্যাঁ"—বলিয়া পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার বিছানায় রাখিয়া বলিলাম, "তোমার ছেলেকে সন্দেশ কিনে দিও।"

ঝি মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছেলেকে ? ছেলে কোথা পাব বাবু ? আমার কি ছেলে আছে ?"

"ওঃ। আচ্ছা, তোমার ভাইকে, কি যাকে হোক কিনে দিও।"

ঝি আমার মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিল, "বাবু, আপনি কি রাগ করে চল্লেন ?"

"না না, রাগ কিসের ?"

"দেখুন, আমরা হলাম মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ! আমরা কি কথা জানি ? কি কথা বলতে কি কথা বলে ফেলি ; তায় কি রাগ করতে আছে ?"

এইবার আমার মনটা একটু নরম হইল। বলিলাম, "না ঝি, রাগ করিনি।"

"আচ্ছা, আবার কবে আসবেন বলুন।"

"আবার শীঘ্রই একদিন আসবো।"

"এই সময়, বুঝেছেন। বারোটা বাজলেই আমি মনিব বাড়ী থেকে বেরুই। আপনি বরঞ্চ সোজা এই বাড়ীতেই আসবেন, রাস্তাপথে আর দেখা করে কায নেই।"

"আচ্ছা, তাই আসবো।"—বলিয়া আমি কলেজে ফিরিয়া গেলাম। প্রক্‌সির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম, সুতরাং হাজিরার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই।

রাত্রি ১০টায় এ ডায়েরি লিখিতে বসিয়াছিলাম, এখন প্রায় ১২টা বাজে। খানিক ভাবিতেছি, খানিক লিখিতেছি। ঝির অনেক আবোলতাবোল বাজে কথার মধ্যে দুইটি কথা প্রণিধান-যোগ্য। ১ম—মধুপুর হইতে উহাদের অকালে তিরোধানের কারণ আমার শ্রবণযোগ্য নহে; তাহাতে আমার আপশোস বাড়িবে বৈ কমিবে না। ২য়—সে সব এখন আমাদের মন থেকে মুছে ফেলাই ভাল। তবে, তাহারও মনে মুছিয়া ফেলিবার যোগ্য জিনিষ আছে। মোছা কি যায় পাগলী? মুছিতে গেলে যে বুক ভাঙ্গিয়া যায়! যাহা হউক, মধুপুরে শাড়ী-সঙ্কেতে মনে যে আশার অঙ্কু-রোদ্গম হইয়াছিল; আজ ঝির কথায় তাহা পত্রশোভিত হইয়া উঠিল। 'পত্র'—পল্লব অর্থেই লিখিয়াছি; কিন্তু এখন মনে হই-তেছে, ঝির হাতে আমি যদি তাহাকে পত্র অর্থাৎ চিঠি পাঠাই, এবং সে আমাকে ঐ উপায়ে পত্র লেখে, তাহা হইলে যথার্থই আমাদের প্রেমতরু পত্রশোভিত হয়।

২২শে অগ্রহায়ণ।

আজ আবার বামা ঝির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম—তাহার নাম বামাসুন্দরী। শৈলর অনেক গল্পই সে করিল। বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, শৈলও আমার স্মৃতিকে তাহার অন্তরের

অন্তস্তলে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। চিঠি পাঠাইবার প্রস্তাব করিলাম, কিন্তু বামা ত রাজি হয় না। বলে, "বউগিন্নীর সঙ্গে সেভাবের কোন কথা ত আজ পর্য্যন্ত আমার হয় নি; চিঠি দিতে গেলে যদি তিনি রেগে চেঁচিয়ে হিতে বিপরীত করে' বসেন!" ঠিক বটে! মনে যার যাই থাকুক, অন্য কাহারও কাছে ধরা পড়িয়া গেলে ত সেটা সুখের হয় না। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে বলিল, "আচ্ছা, আগে বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝে দেখি।"—অর্থাৎ আমার ২।১টি কথা সে তাহার কাছে বলিয়া দেখিবে। আগামী পরশ্ব দ্বিপ্রহরে আবার আমায় যাইতে বলিয়াছে।

২৪শে অগ্রহায়ণ।

আজ গিয়াছিলাম; ঝি বলিল, গতকল্য বিকালে কৌশলে আমার নাম তাহার নিকট সে পাড়িয়াছিল। শৈল কাঁদিয়াছে, কিন্তু রাগ করে নাই। চিঠির কথা পাড়িতে সাহস হয় নাই, আজ কিংবা কাল সুবিধামত সে কথা পাড়িবে।

২৫শে অগ্রহায়ণ।

চিঠির কথা ঝি পাড়িয়াছিল; সে আংশিকভাবে রাজি হইয়াছে, অর্থাৎ আমি চিঠি লিখিব, কিন্তু সে লিখিবে না— তাহার যাহা বক্তব্য তাহা ঝির মুখে বলিয়া পাঠাইবে মাত্র। সে বলিয়াছে, "তিনি অবিবাহিত, সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা

তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আমি এখন পরস্ত্রী, আমার কি উচিত চিঠি লেখা!” আচ্ছা, আপাততঃ তাহাই হইবে—শনৈঃ পন্থা।

২৭শে পৌষ।

চিঠি ত একে একে অনেকগুলিই লিখিলাম; উত্তর ত একখানিরও মিলিল না। ঝির মুখে উত্তর যাহা পাই তাহাতে কিছুমাত্র পরিতৃপ্তি হয় না; অথচ বখশিশ আকারে এই একমাসে চিঠির মাশুলও দিলাম অনেক টাকা। ঝি বেটি আমার সঙ্গে চাতুরী করিতেছে কি না কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজ সে বলিয়াছে, আমার সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ শৈলর কোন একটা নিদর্শন সে আমাকে আনিয়া একদিন দেখাইবে।

২৯শে পৌষ।

ঝি বলিল, শৈল বলিয়াছে, “তাঁকে চিঠি লিখি সে কি আমার অসাধ, কিন্তু আমি যে পরস্ত্রী! তবে তাঁর সন্তোষের জন্যে এই একখানা কাগজে আমার নামটি লিখে দিচ্চি, এইটি তাঁকে দিও।” এক টুকরা শাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী গুপ্তা। বড় হইলে শৈলর হাতের লেখা আমি কখনও দেখি নাই—লেখাটি আমার চোখে এমন সুন্দর লাগিতেছে! যেন প্রায় পুরুষ মানুষের লেখা। হইবে না কেন, সে ত বোধোদয় পড়িয়া মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লয় নাই; অনেক বয়স অবধি ইস্কুলে রীতিমত লেখা-

পড়া করিয়াছে। পাইয়া অবধি কাগজখানি অমূল্য নিধির মত আমি বুকে করিয়া রাখিয়াছি। কতবার যে সেখানি পড়িয়াছি বলিতে পারি না। ঝি আরও বলিল, কাগজখানি লিখিয়া দিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শৈল উঠিয়া গিয়াছিল। কথাটা শুনিয়া অবধি আমি ভাবিতেছি, এ কান্নার অর্থ কি? ইহার একমাত্র অর্থ যাহা আমার মনে হইতেছে তাহা এই—যাহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারিলেও তৃপ্ত হইত না, তাহাকে দিলাম কি না, কালির আঁচড় কাটা একটুকরা তুচ্ছ কাগজ! আর কিছু দিবার অধিকার আমার নাই!

অধিকার আছে শৈল, সবই দিবার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিবে কি? আমি কয়েকখানি আধুনিক বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়াছি, তাহাতে লেখকগণ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিলেই যথার্থ বিবাহ হয় না; পরস্পরে প্রতি প্রেম থাকিলে তাহাই আসল বিবাহ। যে নরনারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ নহে, কেবলমাত্র লৌকিক বিবাহের বন্ধনই যাহাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন, তাহাদের পরস্পর সাহচর্য্যকে একটা অতি কদর্য্য আখ্যা দিয়াছেন। প্রেমের মিলনকেই তাঁহারা যথার্থ পবিত্র মিলন বলিয়া মনে করেন। বহিগুলি ঝির হস্তে শৈলকে পাঠাইয়া দিব মনে করিয়াছি: পড়িলে সে বুঝিতে পারিবে, যে যাহাকে যথার্থ ভালবাসে, সে তাহাকে চিঠি লিখিলে কিছুমাত্র দোষের কার্য্য হয় না; বরং যথার্থ ভালবাসার পাত্রকে ত্যাগ করিয়া, মন্ত্রপড়া বিবাহের স্বামীর ঘর করিতে থাকিলেই নারীর অধিকার

খর্ব্ব হয়, নারীত্বের অপমান হয় এবং তাহার শুভ্র আত্মা কলঙ্কলিপ্ত হইয়া যায়।

৫ই মাঘ।

আজ কয়েকখানি বাঙ্গলা উপন্যাস ও মাসিক পত্র ঝির হস্তে শৈলকে পাঠাইয়াছি।

১০ই মাঘ।

বহিগুলি পড়িয়া শৈল বলিয়াছে বেশ বহি। আরও বহি চাহিয়াছে। আজ ঝিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি, শৈলর সঙ্গে একটিবার আমি দেখা করিতে চাই—আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। যদি কোনও নিভৃত স্থানে দশ পনেরো মিনিটের জন্যও একবার তাহার দেখা পাই, দুইটা কথা কহিতে পাই, তবে প্রাণে অনেকটা শান্তি পাই। ঝি বলিল, সে বলিয়া দেখিবে, কিন্তু শৈল এ প্রস্তাবে সম্মত হয় কি না খুব সন্দেহ।

১৪ই মাঘ।

ঝি বলিল, শৈল কিছুতেই রাজি হইতেছে না। বলিয়াছে আমরা মনে মনে দুজনে ত দুজনারই আছি, এ জন্মে ইহার অধিক আর কিছুই হইবার নয়। আজ শৈলকে একখানি খুব ভাল উপন্যাস পাঠাইয়া দিয়াছি। ইহাতে লেখক অকাট্যভাবে

প্রমাণ করিয়াছেন, (প্রেমহীন বিবাহের স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ও সতীত্ব রক্ষার প্রবৃত্তি, নারীচিত্তের একটা সেকেলে অন্ধ কুসংস্কার মাত্র।

২২শে মাঘ।

নারীর অধিকার, বিবাহ বন্ধনের কুসংস্কার, প্রেমের স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নব্যমতের সমর্থক বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া এতদিনে শৈলর মন ফিরিয়াছে। সে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইয়াছে। তবে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে সে আসিবে না; স্থান সে নিজে নির্ব্বাচন করিবে। কোনও একটা উপায় স্থির করিতে পারিলেই সে আমায় জানাইবে।

সে ত রাজি হইয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত আমার গোপনে সাক্ষাৎ করাটা উচিত হইবে কি না, আমি যে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বোক্ত বহিগুলি আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতে হইবে। যুক্তিতে বেশ বুঝিতে পারি যে এ কার্য্য কিছুমাত্র অন্যায় নহে, কিন্তু জন্মগত সংস্কার এমনি জিনিষ, তাহার প্রভাব কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় না। এইখানেই স্ত্রীলোক ও পুরুষে প্রভেদ। যে প্রথমে আমায় চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে অত আপত্তি করিয়াছিল, সে আজ আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে প্রস্তুত; আর আমি, গোড়ায় পাদ্রীগিরি করিয়া, কত কষ্টে তাহাকে জপাইলাম, কিন্তু শেষ

পৈঠায় পৌঁছিয়া জলে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে আমিই ইতস্ততঃ করিতেছি। আসল কথা, স্ত্রীলোকেরাই যথার্থ এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট; আমরা পুরুষরা মডারেট হইয়া—দুই নৌকায় পা দিয়া—মারা গেলাম।

১৭ই ফাল্গুন।

ঝি বলিল, শনিবার বিডনষ্ট্রীটের কোনও গৃহে একটা বিবাহ আছে, শৈল সেখানে নিমন্ত্রিতা। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেখানে সে যাইবে—অবশ্য বাড়ীর গাড়ীতে। রাত্রি দশটায় মোটর আবার শৈলকে আনিতে সেখানে যাইবে। ঐ দিন সন্ধ্যায় ঠিক সাড়ে-সাতটার সময়, হেদুয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ফুটপাথে আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বিডন ষ্ট্রীটের দিক হইতে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া সেখানে দাঁড়াইবে; সেই গাড়ীতে নীলাম্বরী বারাণসী শাড়ী পরিহিতা একজন মহিলা থাকিবেন, এবং ঝিও থাকিবে। ঝি নামিয়া আমায় সঙ্কেত করিলেই আমি ট্যাক্সিতে উঠিয়া পড়িব। ট্যাক্সিতে যতক্ষণ থাকিব, শৈলর সহিত আমি একটিও কথা কহিতে পাইব না; কথা কহিলে, হিতে বিপরীত হইবে। সহরের বাহিরে কোনও নির্জ্জন স্থানে সেই ট্যাক্সি আমাদের লইয়া যাইবে। কোথায় যাইতে হইবে ইত্যাদি পূর্ব্বেই ঝি ট্যাক্‌সিওয়ালাকে উপদেশ দিয়া রাখিবে। সেখানে, ঘড়ি ধরিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কালমাত্র সেই শাড়ীধারিণীর সহিত আমি কথোকথন করিতে পারিব। তাহার পর ট্যাক্সি ফিরিয়া, হেদুয়ার সেই

কোণে দাঁড়াইবামাত্র ট্যাক্সি হইতে আমায় নামিয়া যাইতে হইবে ঝি সেখানে উপস্থিত থাকিবে।

ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি সে ট্যাক্সিতে যাবে না?"

"না। আমি সঙ্গে থাকলে আপনাদের কথাবার্ত্তায় কি সুবিধে হবে? আমার না থাকাই ভাল।"—বলিয়া সে আমার প্রতি একটি বক্র কটাক্ষপাত করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে জায়গাটা কোথায়?"

ঝি বলিল, "তা বউ গিন্নী এখনও আমায় বলেন নি। সেইদিন আমায় জানাবেন। তবে বল্লেন, স্থানটি খুব নির্জ্জন, কোনও বাধা বিঘ্নের ভয় সেখানে নেই।"

কিন্তু আমার মনে একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। কি জানি, ইহার ভিতর কোনও দাগাবাজি নাই ত? আমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য ইহা একটা ফাঁদ নয় ত? আমি ঝিকে বলিলাম, "দেখ, ও ভাবে ট্যাক্সিতে উঠে কলকাতার বাইরে যেতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই; কিন্তু আমি শুধু তোমার মুখের কথার উপর নির্ভর করতে পারিনে।"

"কিসে নির্ভর করতে পারেন?"

"শৈল নিজে হাতে আমায় চিঠি লিখলে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।"

ঝি একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু, তিনি কি চিঠি লিখতে রাজি হবেন?"

আমি বলিলাম, "তার হাতের চিঠি না পেলে আমি কিন্তু যাব না, একথা তাকে বোলো।"

ঝি বলিল, "আচ্ছা, বলে দেখি; তিনি কি বলেন। আপনি কাল একবার—উহুঁ, পর্শু—পর্শু ত শুক্রবার? পর্শু একবার আসবেন। তিনি কি বলেন, আপনাকে জানাব।

১৯শে ফাল্গুন।

শৈল আমায় চিঠি লিখিয়াছে। প্রিয়তম কিংবা প্রাণেশ্বর এরূপ কোনও সম্ভাষণ তাহাতে নাই। কেবল মাত্র লেখা আছে—

"শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৷টায় হেদুয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া থাকিও। আমি ট্যাক্সিতে আসিয়া তোমায় তুলিয়া লইয়া যাইব।

শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী গুপ্তা।"

শৈলর সেই নাম স্বাক্ষরযুক্ত ফুলস্ক্যাপ কাগজের টুকরাটি বাহির করিয়া, হাতের লেখা মিলাইয়া দেখিয়াছি—সেই লেখা, সেই টান—কোনও প্রভেদ নাই! এখানি তাহারই স্বহস্ত লিখিত লিপি তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হৃদয়! তুমি শান্ত হও—সুখের আতিশয্যে ফাটিয়া যাইও না। আজ এখন রাত্রি ৯৷৷টা—আর ২২ ঘণ্টা। এ ২২ ঘণ্টা কি করিয়া কাটাইব জানি না। দেহ ক্ষণে ক্ষণে পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। আহ্লাদে পাগলের মত হইয়াছি। কত আশা, কত কল্পনাই যে মনোমধ্যে উদিত হইতেছে!

২৯শে ফাল্গুন ।

দশদিন ডায়েরি ছুঁই নাই—এ ডায়েরি রাখিবার আর আবশ্যকতা নাই—এ পৃথিবী যদি এই মুহূর্ত্তে রসাতলে যায় তাহাতেও আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

সেই শনিবারের কাল-সন্ধ্যায়, যথাসময়ে আমি হেদুয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। বিডন ষ্ট্রীটের দিক হইতে ট্যাক্সিও আসিয়াছিল, তাহাতে নীলাম্বরী বারাণসী পরিয়া একজন বসিয়াও ছিল, ঝিটাও নামিয়া ছিল, আমিও ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়াছিলাম। ট্যাক্সি তখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া, ধর্ম্মতলা পার হইয়া, গড়ের মাঠের দিকে ছুটিল। ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি গিয়া ইচ্ছা হইয়াছিল বলি, "এই বাগানেই নামা যাক এস, বেশ নিরিবিলি পাওয়া যাবে।" কিন্তু গাড়ীতে কথা কহিতে বারণ, পাছে হিতে বিপরীত হয়, এই আশঙ্কায় নীরব রহিলাম। ট্যাক্সি গঙ্গার ধার দিয়া খিদিরপুর অভিমুখে ছুটিল। তাহার পর, কোথা দিয়া কোথায় যে গেল আমি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ওদিকটা আমি একেবারেই চিনি না। ক্রমে দেখিলাম, দুই ধারে খোলা মাঠ রাখিয়া ছুটিতেছি। সরকারী পাকা রাস্তা, কিন্তু একেবারে নির্জ্জন,—রাস্তার পার্শ্বে আলোকস্তম্ভও নাই। ট্যাক্সি আর থামিতে চাহে না। অনুমান হইল, প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমরা ছুটিতেছি। অবশেষে ট্যাক্সি একটা বাগানের ফটকের কাছে থামিল। ভিতরে একটা বাগান বাড়ীর মত দেখা গেল, গাড়ী বারান্দায় আলো জ্বলিতেছে। সে নামিয়া

নিম্নস্বরে আমায় বলিল, "আসুন।"—আমি কম্পিত বক্ষে নামিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। বাড়ীটার বারান্দায় উঠিবামাত্র নীল শাড়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসৃত হইল; সভয়ে দেখিলাম, শিকারের খাকী পোষাক পরা পুরুষ মূর্ত্তি,—স্বয়ং প্রবোধ গুপ্ত—হস্তে চাবুক।

দেখিয়া, আমার মাথাটা বন বন করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। পড়িয়া যাইবার ভয়ে আমি দেওয়াল ধরিলাম। বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঝি শয়তানী এই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

প্রবোধ তখন মালী মালী বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মালী আসিয়া কক্ষদ্বার খুলিয়া, ভিতরে আলো জ্বালিয়া দিল। প্রবোধ কঠোর স্বরে আমায় বলিল "এস।" মালীকে বলিল, "তুম্ আভি যাও।"

আমি কম্পিত পদে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দরজায় বন্ধ করিয়া, একটা চেয়ারে বসিয়া প্রবোধ বলিল, "কি প্রেমিকবর? প্রেম করবে?"

আমার মুখ দিয়া কথা সরিল না। আমায় কাঁপিতে দেখিয়া বলিল, "বস।"

আমি একটা চেয়ারে বসিলাম। প্রবোধ বলিল, "পরের স্ত্রীর প্রতি লোভ করলে, কি দণ্ড শাস্ত্রে বিহিত আছে জান? নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন।"—বলিয়া পকেট হইতে একটা বৃহৎ শিকারীর ছুরী (**hunting knife**) বাহির করিয়া তাহার ফলা খুলিল।

দেখিয়া, আমার আত্মপুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি কাঁদিয়া উঠিয়া হাত যোড় করিয়া বলিলাম, "আমায় মাফ করুন, আমার কিছু

দোষ নেই। আপনার স্ত্রীই আমায় চিঠি লিখে ডেকে পাঠিয়েছিল।"

প্রবোধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কৈ সে চিঠি?"

"এই যে"—বলিয়া বুকপকেট হইতে সেই অভিশপ্ত চিঠিখানা বাহির করিয়া আমি প্রবোধ গুপ্তের সামনে ফেলিয়া দিলাম।

প্রবোধ তাহা খুলিয়া বলিল, "তোমার বিশ্বাস, এই চিঠি শৈল তোমায় লিখেছে?—নির্ব্বোধ! এ আমার হাতের লেখা। দেখ।" বলিয়া বুক পকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া কি লিখিয়া চিঠিখানা আবার আমার সামনে ফেলিয়া দিল। দেখিলাম, যেখানে শৈলর স্বাক্ষর ছিল, তাহার নিম্নে দ্বিতীয় স্বাক্ষর হইয়াছে শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী গুপ্তা। একই লেখা।

তখন বুঝিলাম, সেই ফুলস্ক্যাপের টুকরায় সেই স্বাক্ষরও ইহারই লিখিত। ঝি সর্ব্বনাশী প্রথমাবধিই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

প্রবোধ বলিল, "শোন বলি। ছেলেবেলায় একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করেছ বলেই, বড় হয়ে, বিবাহের পরও, সে মেয়ে—বিশেষ হিন্দুর মেয়ে—তোমার প্রেমে হাবুডবু খাবে এ বিশ্বাস ত্যাগ কর। আমাদের বিবাহের পর, তোমার গল্প শৈল আমার কাছে করেছিল, ঢাকা থেকে ফিরে ইস্কুলের ঠিকানায় তুমি তাকে যে চিঠি লিখেছিলে—যদিও সে চিঠি সে দেখেনি—সে চিঠির কথাও আমাকে বলেছিল। তারপর মধুপুরে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন

আমায় বলেছিল, এই যে লোকটি গেল, ঐ সেই নির্ম্মল। নির্ম্মলের মনে যে এত মলা, তখনও আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, পাঁচজনের মত তুমিও মধুপুরে পুজোর ছুটিতে শুধু বুঝি বেড়াতেই এসেছ। তারপর পুজোর নিমন্ত্রণের সঙ্গে তোমার সেই প্রেমের চিঠি শৈল আমায় দেখালে। সে প্রথমে রাজি হয়নি, আমারই পীড়াপীড়িতে সে বিজয়া দশমীর বিকালে নীলাম্বরী বারাণসী পরে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আমি শুধু একটু আমোদ করবার জন্যেই শৈলকে দিয়ে ঐ কাযটি করিয়েছিলাম। তার পর সাহস পেয়ে পাছে তুমি আর কোনও রকমে তাকে বিরক্ত কর, এই ভয়ে, তারই অনুরোধে, পরদিন আমরা মধুপুর ত্যাগ করি। তার পর, তুমি কলকাতায় এসে ঝির সঙ্গে দেখা করলে। ঐ ঝির মা, আমার মায়ের ঝি ছিল, এখন ও আমার স্ত্রীর ঝি, অত্যন্ত বিশ্বাসী, সে এসে প্রথম দিনই তোমার সব কথা আমাদের দুজনের কাছে প্রকাশ করে। তুমি ঝির হাতে যে সমস্ত চিঠি পাঠাতে, ঝি আমাকে নিয়ে গিয়ে দিত। আমি কোন কোন দিন আমোদ করে শৈলকে পড়ে শোনাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনত না, ছুটে পালিয়ে যেত। তার পর আজকের এ ব্যাপারের পরামর্শ শুনে শৈল আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, তাকে কি সাজা দেবে? আমি বলেছিলাম, শাস্ত্রেই আছে, এ অপরাধের দণ্ড নাসিকা ও কর্ণ-চ্ছেদন, তাই করব। শুনে সে আমাকে মিনতি করেছে, তা যেন আমি না করি। সুতরাং এ যাত্রা তোমার নাক কাণ বেঁচে গেল। কিন্তু সাবধান, ফের যদি কখনও তুমি আমাদের ত্রিসীমানায়

আস, তবে তোমার নাক কাণ আমি নিশ্চয়ই কেটে নেবো। আজ তোমাকে, পরস্ত্রীর পানে পাপচক্ষে চাইতে নেই এই উপদেশটি শিক্ষা দেবার জন্যে, কেবল ঘা কতক চাবুক মেরে বিদায় করব।" —বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাবুক হাতে লইল। আমার প্রতি ঘূর্ণিত লোচনে চাহিয়া, বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "উঠে দাঁড়াও।"

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম, কিন্তু দাঁড়াইলাম না। এক লম্ফে দরজার নিকট গিয়া, তাহা খুলিয়া, বারান্দা হইতে বাগানে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণপণে ফটকের দিকে ছুটিলাম। ফটক হইতে বাহির হইয়া, সেই অন্ধকার পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া পথে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলাম; কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, শরীরে রক্তপাত হইল, একপাটি জুতা ছিটকাইয়া কোথায় গিয়া পড়িল। উঠিয়া ভাবিলাম, ট্যাক্সিতে প্রবোধ যদি আমায় ধরিতে আসে? তৎক্ষণাৎ অপর জুতাপাটি খুলিয়া ফেলিয়া, রাস্তা হইতে নামিয়া, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মাঠের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সাপে খাইবে কি বাঘে খাইবে তখন সে জ্ঞান আমার কিছুমাত্র ছিল না। কি একটা বড় গাছ দেখিয়া, তাহার গুঁড়ির আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, বাগানের দিক হইতে একখানা মোটর আসিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া গেল। আমি তখন নগ্ন পদে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় আসিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। দেহ অবসন্ন—চলি, আবার পথে বসি। এ

কোন্ স্থান, কলিকাতা হইতে কত দূর আসিয়াছি, কিছুই জানি না। বিশ্রাম করিয়া, আবার উঠিয়া অন্ধকারে পথ চলি।

এইরূপে ক্রমে রজনী প্রভাত হইলে, একখানি গ্রাম পাইলাম। শুনিলাম সেখান হইতে কলিকাতা হাঁটা পথে সাত ক্রোশ,—দুই মাইল দূরে ষ্টেশন আছে, সেখান হইতে রেলে কলিকাতা যাওয়া যায়। টাকা পয়সাও সঙ্গে নাই যে ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া বাড়ী আসিব। গত কল্য সন্ধ্যায় বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় এমন উন্মত্ত হইয়াছিলাম যে, মানিব্যাগটিও সঙ্গে লইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। পা কাটিয়াছে, ফুলিয়াছে, ব্যথায় আড়ষ্ট—চলিবার শক্তি নাই। তবু প্রাণের দায়ে, গ্রামের বাজারে ভিক্ষা করিয়া কিছু খাইয়া, ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। দ্বিপ্রহরে আর একটা গ্রাম পাইলাম। সেখানেও ভিক্ষা করিয়া কিছু খাইয়া, সন্ধ্যার সময় খিদিরপুরে পৌঁছিলাম।

বাড়ী পৌছিতে রাত্রি আটটা বাজিল। সেখানে পিতামাতার নিকট, দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার যে কাল্পনিক কাহিনী বলিলাম, সেটা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না; তবে সারারাত ও সারাদিন উৎকণ্ঠায় যাপন করার পর, আমাকে পাইয়া তাঁহারা ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন। মা স্বহস্তে আমার গা মুছাইয়া ভাত বাড়িয়া খাইতে দিলেন। রাত্রেই কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তিন দিন তিন রাত্রি জ্বর ঘোরে অচেতন ছিলাম। পর্শু হইতে জ্বর ছাড়িয়াছে। আজ রুটি খাইয়াছি।

অলকা

কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসের একটী কক্ষে একদিন অপরাহ্নকালে বিনোদবিহারী নামক একটি যুবক তাহার কেওড়া কাঠের তক্তপোষ খানির উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে কড়ি কাঠ গণনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের ঘড়িতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। ভৃত্য আসিয়া ঘরে ঘরে বাবুদের নিকট হইতে জলখাবারের ফরমাস ও পয়সা লইতে লাগিল; কিন্তু বিনোদের নিকট সে আসিল না; কারণ মাসখানেক হইতে, "অম্বল" হওয়ার অজুহাতে বাজারের খাবার খাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সাড়ে চারিটা বাজিলে ভৃত্য খাবার লইয়া আসিল। অন্যান্য ছাত্রেরা খাবার খাইতে লাগিল; কেহ কেহ তদুপরি চা পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। "পাণ নিয়ে আয়," "সোরাইয়ে জল রাখিস্‌নি!" প্রভৃতি শব্দে বাসা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদ সেই ভাবেই শুইয়া আছে। শুইয়া শুইয়া সে কেবল আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছে।

বেচারী বিনোদ বড়ই বিপন্ন। তাহার বাড়ী কুমিল্লা জেলার

কোনও গ্রামে। আজ প্রায় দুইমাস কাল তাহার বাড়ী হইতে না আসিয়াছে টাকাকড়ি, না কোনও চিঠিপত্র। মা বাপ বাঁচিয়া নাই, খুড়া মহাশয় বাড়ীর কর্ত্তা, তিনি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে নায়েবী-কর্ম্ম করেন, অবস্থা ভালই। টাকাকড়ি এতদিন নিয়মিত ভাবেই ত তিনি পাঠাইতেন, হঠাৎ এ কি হইল? পূজার ছুটি হইতে আর দুই সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে। কলেজের বেতন দুইমাস বাকী পড়িয়াছে, আগামী কল্য তাহা দাখিল করিবার শেষ দিন,—না পারিলে, সে 'ডিফল্টার' হইয়া যাইবে, লেকচারে উপস্থিত থাকিলেও প্রতিদিন তাহাকে 'অ্যাবসেণ্ট' করিবে, হয়ত পার্সেণ্টেজ নষ্ট হইয়া যাইবে। একটা বৎসরই মাটি! মেসের টাকার জন্য ম্যানেজার বাবু ত নিত্য অপমান করিতেছেন। এই দুইমাসে, বন্ধুগণের নিকট ১০৷১২৲ ধার হইয়াছে। ছুটিতে তাহারা বাড়ী যাইবে, জিনিষপত্র কিনিবে, তাহারাও টাকার জন্ত তাগাদা লাগাইয়াছে। বাড়ী নিকটে নয়, তথাপি টিকিট কিনিবার টাকা থাকিলে একবার না হয় খোঁজ লইয়া আসিত যে ব্যাপারটা কি; তাহারও উপায় নাই। গ্রামস্থ দুইজন বন্ধুকেও বিনোদ পত্র লিখিয়াছে, তাহারাও কোনও জবাব দেয় নাই।

পাঁচটা বাজিল। অন্যান্য ছাত্রগণ কেহ বায়স্কোপ দেখিতে, কেহ গোলদীঘি বা গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। বিনোদ তখন উঠিয়া, সোরাই হইতে জল ঢালিয়া মুখ হাত ধুইয়া, ঢক্‌ঢক্ করিয়া সেই জল খানিকটা খাইয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত

করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর জামাটি গায়ে দিয়া, বাসা হইতে প্রাপ্য পাণ দুইটি মুখে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। বড় রাস্তায় পড়িয়া সে উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গ্রামস্থ এক ভদ্রলোক গোয়াবাগানে থাকিয়া কবিরাজী করেন, বিনোদকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি যদি গোটা কতক টাকা ধার দেন তবে আগামী কল্য কলেজের বেতনটা সে দাখিল করিতে পারিবে। সেই আশাতেই বিনোদের এই অভিযান।

যথাসময়ে সে গোয়াবাগানে কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। দেখিল, বৈঠকখানা জনশূন্য। গামছা কাঁধে, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এক ভৃত্য-বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবিরাজ মশায় বাড়ী আছেন?"

বালক বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি আঁচি গিয়েছেন।"

বিনোদ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আঁচি? আঁচি কোথা? সেখানে কি জন্যে গেছেন?"

বালক বলিল, "উগী দেখতে গেছেন।"

বিনোদ বলিল, "ওঃ, রুগী দেখতে রাঁচি গেছেন? ফিরবেন কবে?"

বালক বলিল, "আজ্ঞে, তা কিছু কয়ে যান নি।"

বিনোদ মনে মনে বলিল—"যাক্—এ দফায় তা হলে নিশ্চিন্দি!" একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৈঠকখানা হইতে নামিল। গলি পার হইয়া বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই হেদুয়া

পুষ্করিণী। অন্যমনস্কভাবে, ধীরপদে, সে হেদুয়ার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল।

হেদুয়া তীরস্থ বাগানখানির একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা বহুসংখ্যক পেন্সনপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বৈকালিক বিচরণ-ভূমি। এ সময়ে গোলদীঘির চারিটি ধার যেমন ক্ষিপ্রগামী কলেজের যুবকগণে ভরিয়া যায়, হেদুয়ার তীরদেশে তেমনি মন্থরচরণ বৃদ্ধগণেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এখানে ইহাঁরা কিয়ৎক্ষণ পাদচারণে ক্লান্ত হইলে, কাষ্ঠমঞ্চ-নিম্নস্থ বেঞ্চগুলি অধিকার করিয়া বসিয়া পড়েন। বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনায়, নানাবিধ গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কোনও দিন বা কোনও দল, নিকটস্থ তিনকড়ি মোদকের দোকান হইতে প্রসিদ্ধ 'কস্তুরী' সন্দেশ আনাইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দে ভক্ষণ করেন।

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ক্লান্তপদে এদিক ওদিক একটু বেড়াইল। কিন্তু দেহেও বল নাই, মনেও উৎসাহ নাই;—সুতরাং শীঘ্রই সে একটি বেঞ্চের প্রান্তভাগ খালি পাইয়া বসিয়া পড়িল। সেই বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, চশমা চোখে দিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিলেন; বিনোদ এক নজর মাত্র তাঁহার পানে চাহিয়া, হেদুয়ার স্নিগ্ধশ্যামল জলরাশির উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল।

দিবালোক ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বিনোদ জলের পানে একদৃষ্টে সেইরূপ তাকাইয়া, আপন সঙ্কটের বিষয় চিন্তা করিতেছে। ক্রমে তাহার পরলোকগত মাতাপিতাকে মনে পড়িল। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে, আজ কখনও এমনভাবে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইত না। পিতা আগে যান; তাহার পর, এই দুই বৎসর হইল মাতৃদেবীও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মার মৃত্যু সময়ে বিনোদ উপস্থিত ছিল; সেই দৃশ্য মনে পড়িবামাত্র সে কিছুতেই আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল—সেই বৃদ্ধ বাবুটি কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিতেছেন—"ছোকরা!"

বিনোদ লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, ভারি গলায় বলিল, "আজ্ঞে!"

"কে তুমি, তোমার নাম কি?"

বিনোদ নাম বলিয়া, অবনত নেত্রে বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ অতি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?"

বিনোদ কথা কহে না।

"বাড়ী কোথা তোমার?"

"কুমিল্লা জেলা।"

"এখানে কি কর? কোথা থাক?"

"ল কলেজে পড়ি। মেসে থাকি।"

"তোমার কি হয়েছে? আমি বুড়ো মানুষ, আমায় বলনা, তাতে লজ্জা কি বাবা!"

এইবার বিনোদ মুখ তুলিল। বাবুটির পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল; তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না। উন্নতকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, হাতের হাড়গুলি মোটা, বক্ষদেশ প্রশস্ত—ইনি যৌবনে একজন বলশালী লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। মাথার চুলগুলির অর্দ্ধেক সাদা হইয়া গিয়াছে। গুম্ফ শ্মশ্রু ক্ষৌরিত; গায়ে সাদা জিনের কোট, পরিধানে থান ধুতি, পায়ে প্যানেলার জুতা, পঠিত বহিখানির ভিতর একটি আঙুল পূরিয়া, বইখানি মুড়িয়া হাতে ধরিয়া আছেন। বিনোদ মলাটে সেখানির নাম দেখিল "ভক্তিযোগ।"

বিনোদকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কুমিল্লা জেলায় বাড়ী বল্লে না? আমি এক সময় কুমিল্লায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, বোধ হয় তখন তুমি জন্মাও নি। কুমিল্লা জেলায় অনেক স্থানেই আমি টুর করে বেড়িয়েছি। কোন্ জায়গায় তোমার বাড়ী বল দেখি?"

এই বৃদ্ধ পূর্ব্বে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন শুনিয়া বিনোদের মনে একটু সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমাদের বাড়ী সুবর্ণগ্রামে।"

বৃদ্ধ বলিল, "সুবর্ণগ্রাম! কৈ মনে করতে পারছিনে।"

অতঃপর তিনি বিনোদকে তাহার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে এক আধটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার উপস্থিত

সঙ্কটের বিষয় সমস্তই অবগত হইয়া বলিলেন, "এই জন্যে তুমি কাঁদছিলে ?"

এবার বিনোদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। সে একটু গর্ব্বিত ভাবেই বলিল, "না, সে জন্যে আমি কাঁদিনি! আমার মাকে মনে পড়েছিল, তাই চোখে জল এসেছিল।"

এতক্ষণে দিবালোক প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল। বেঞ্চখানিতে স্থান রহিয়াছে দেখিয়া, অপর দুইটী লোক আসিয়া তথায় উপবেশন করিল। বৃদ্ধ দেখিলেন, সেখানে কথাবার্ত্তার আর সুবিধা হইবে না। বলিলেন, "আমার সঙ্গে তুমি আসবে? কাছেই আমার বাড়ী, বেশী দূর নয়। তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যাইতে প্রথমে বিনোদের মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইল। তারপর সে ভাবিল, "ইনি গুণ্ডাও নন, আমার কাছে টাকা কড়িও নেই, তবে আর ভয়টা কিসের?" বলিল, "বেশ ত, চলুন।"

বৃদ্ধ উঠিয়া ধীরপদে বাগানের বাহির হইলেন, বিনোদ তাঁহার অনুসরণ করিল।

পথে যাইতে যাইতে বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার পরিচয় তোমায় এখনও দিইনি। আমার নাম শ্রীকেদারনাথ সরকার, আমরাও কায়স্থ। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করতাম, বছর পাঁচ ছয় হল পেন্সন নিয়েছি। দেশে শরীর ভাল থাকে না, তাই কলকাতাতেই থাকি।"

বিনোদ নীরবে কেদার বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাণিকতলা ষ্ট্রীট



দিয়া চলিয়া, ক্রমে একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবুটি এক বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া, কড়া নাড়িতে লাগিলেন। উপর বারান্দা হইতে তরুণী কণ্ঠে শব্দ হইল, "কে?" কেদার বাবু বলিলেন, "আমি, মা, দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

অর্দ্ধমিনিট পরে, দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হইল, "বাবা, আজ যে এত দেরী?" বিনোদ দেখিল লণ্ঠন হস্তে একটী মেয়ে; পিতার সহিত একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

"এই বাবুটির সঙ্গে কথা কইতে কইতে আজ একটু দেরী হয়ে গেল মা। এস হে বিনোদ।"—বলিয়া কেদার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বিনোদ প্রবেশ করিলে, কেদার বাবু দরজায় খিল বন্ধ করিলেন। মেয়েটি লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইল, দুইজনে তাহার পশ্চাৎ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বিনোদকে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মেয়েটি অপর দিকে চলিয়া গেল। বিনোদ দেখিল কক্ষটি ক্ষুদ্র, তাহার এক পার্শ্বে একটা তক্তপোষের উপর ফরাস বিছানা পাতা, তাহার উপরে দুইটা তাকিয়া বালিস, অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট দুইখানি চেয়ার। কেদার বাবু বিনোদকে সেই টেবিলের উপর বসাইয়া ডাকিলেন "রাধে!"

বিনোদ মনে করিয়াছিল, যে মেয়েটি লণ্ঠন দেখাইয়া আনিয়াছিল তাহারই নাম বুঝি রাধে। কিন্তু দেখিল, সধবাবেশিনী গৌরবর্ণা

নাতিস্থূলা এক রমণী, বয়স বোধ হয় চল্লিশ হইবে, প্রবেশ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার বাবু বলিলেন, "রাধে, এঁর নাম বিনোদবাবু—বিনোদবিহারী দত্ত, আমাদেরই কায়েস্থ। ল কলেজে পড়ছেন। আজ হেদোর ধারে আলাপ হল, তাই কথাবার্ত্তা কইবার জন্যে সঙ্গে করে এনেছি।" বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।"

বিনোদ মনে করিল, "এত দেখছি ইংরাজি প্রথার ইন্‌ট্রোডকৃশন! পর্দ্দাটর্দ্দাও মানেন না বোধ হয়—ব্রাহ্ম না কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "বেশ। এখানেই কি আপনাদের বাড়ী?"

অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে কথা কহিতে বিনোদের কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। মাথা নীচু করিয়া সে সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিল।

কেদার বাবু বলিলেন, "রাধে, আমাদের একটু চা দিতে পার?—আর, এঁর জন্যে কিছু জলখাবার?"

রমণী বলিলেন, "চায়ের জল ত তৈরি নেই, চড়িয়ে দিই গে। জলখাবার আগে নিয়ে আসবো কি?"

কেদার বাবু বিনোদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আগে খাবারটা খেয়ে নাও, কি বল? ততক্ষণ চা হোক্।"

বিনোদ তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, জলখাবার আমার জন্যে দরকার নেই। শুধু এক পেয়ালা চা হলেই চলবে।"

কেদার বাবু বলিলেন, "তা কি হয়? গৃহস্থের বাড়ীতে এসে একটু মিষ্টিমুখ না করলে তারা ছাড়বে কেন? চা—সে ত বিলাতী ফাঁকি, জলভাজা বৈত নয়!"—বলিয়া তিনি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "যাও, কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও।"—রাধারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণেই পাশের ঘর হইতে ষ্টোভ জ্বলিবার গোঁ গোঁ শব্দ উঠিল। তার পর সেই মেয়েটি একটি কাঁসার রেকাবীতে কয়েক টুকরা ফল এবং দুইটি বড় রসগোল্লা আনিয়া দাঁড়াইতেই কেদার বাবু বলিলেন, "রাখ মা, ঐ টেবিলের উপর রাখ।"

মেয়েটি খাবারের রেকাবী ও জলের গ্লাস টেবিলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, কেদার বাবু বলিলেন, "দাঁড়াও মা—এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। বিনোদবাবু, এইটি আমার মেয়ে অলকা। আর দেখ অলকা, ইনি খুব লেখাপড়া শিখেছেন। এম-এ পাস করেছেন, আইন পড়ছেন।"—বলিতেই মেয়েটি বিনোদের পানে চাহিয়া নমস্কার করিল। বিনোদও প্রতিনমস্কার করিয়া ভাবিল, ইহার মার সঙ্গে যে সময় সে পরিচিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা ত ভুল হইয়া গিয়াছে—ছিছি! কেদার বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার মেয়েটিও মুখ্যু নয় বিনোদ বাবু। আসছে বছর ম্যাট্রিক্ দেবে—হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়ে। বাপ হয়ে বলা উচিত নয়—বেশ বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে।—আচ্ছা, যাও মা, দেখ দেখি চায়ের জল হল কি না। চল হে বিনোদ, খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নেবে চল।

তার পর দুজনে একসঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।”

অলকা চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বিনোদকে লইয়া গিয়া টেবিলের নিকট বসিলেন। খাবার খাইয়া, শীতল জল পান করিয়া বিনোদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

চা পান করিতে করিতে কেদার বাবু বলিলেন, “দেখ বিনোদ, তুমি যে বিশেষ রকম অর্থসঙ্কটে পড়েছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তোমার কলেজের দু মাসের মাইনে, মেসের পাওনা, ধার শোধ করা, গোটা পঞ্চাশ টাকা এখনই তোমার প্রয়োজন। এ টাকা আমি এখনই তোমায় দিতে পরি। কিন্তু সেটা দানস্বরূপ হলে, তোমার তা কখনই ভাল লাগবে না। সেই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি, তুমি আমার মেয়েটিকে দু’মাস পড়াও—তোমায় দু’ মাসের বেতন স্বরূপ অগ্রিম ৫০৲ আমি তোমায় দিচ্ছি। কেমন, তুমি রাজি আছ ?”

বিনোদ প্রায় একমিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, “কতক্ষণ পড়াতে হবে ? কখন ?”

কেদার বাবু বলিলেন, “বিকেল বেলা একঘণ্টা। এই, চারটে থেকে পাঁচটা, কিম্বা পাঁচটা থেকে ছ’টা, যেমন তোমার সুবিধে হয়। তোমার কলেজ কখন ?”

“সকাল বেলা। আর, এ ক’টা দিন পরে ত কলেজের ছুটিই হয়ে যাচ্চে।”

“তা হলে, তোমার মত কি বল।”

বিনোদ বলিল, "আপনি যখন এই সঙ্কটে আমায় উদ্ধার করছেন—আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করলাম।"

"আচ্ছা বেশ। তা হলে কাল থেকেই এস। ইংরেজি, সংস্কৃত আমি নিজেই ওকে পড়াই। এই সন্ধ্যের পর, চা খেয়ে ওকে নিয়ে রোজ বসি। বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত অঙ্কটা তুমি কষিও—অঙ্কে ও একটু কাঁচাই আছে। বস, টাকাটা আমি নিয়ে আসি।"—কয়েক মিনিট পরেই পাঁচখানি নোট আনিয়া তিনি বিনোদের সম্মুখে রাখিলেন।

বিনোদ টাকা কয়টি উঠাইয়া লইল। নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া, নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, দেশ হইতে তাহার এক বন্ধুর পত্র আসিয়াছে। যে জমিদারের এষ্টেটে তাহার খুড়া মহাশয় চাকরি করিতেন, সেই জমিদার কর্ত্তৃক আনীত তহবিল তছরুপের মোকর্দ্দমায় তাহার খুড়া মহাশয়ের দেড় বৎসর জেল হইয়া গিয়াছে। পত্র পড়িয়া বিনোদ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, খুব সময়েই কেদার বাবুর ন্যায় দয়ালু পরোপকারী মহাত্মার দর্শন সে পাইয়াছিল, নহিলে ত তাহাকে অথই জলে পড়িতে হইত!

পরদিন বিনোদ তাহার নূতন ছাত্রীকে পড়াইতে গেল। কেদার বাবু অধ্যাপনা সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া, তাঁহার নিয়মিত

হেদুয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পাঁচটা বাজিলে, অলকার মা তাহাকে চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। প্রথমে কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অবশেষে জলযোগ সমাপনান্তে বিনোদ বাসায় ফিরিয়া আসিল।

এইরূপ দিনের পর দিন চলিতে লাগিল—এবং এ বয়সে এরূপ সান্নিধ্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বিনোদের প্রথমে মনে হইল, তাহার ছাত্রীর স্বভাবটি বড় মধুর! তার পর মনে হইল তাহার দেহের গঠন—বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি—বড়ই সুন্দর; মেয়েটি যেরূপ রূপবতী, বাঙ্গালীর ঘরে সেইরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তার পর মনে হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠস্বরটি বড় মিষ্ট, শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা করে। তার পর মনে হইতে লাগিল, এ মেয়ে যাহার গৃহলক্ষ্মী হইবে, তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ পুরুষ এ জগতে দুর্লভ। তাহার পর বিনোদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বসিল, অলকাকে সে অতিশয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কেন না, যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, তাহার চিন্তা এক দণ্ড মন হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহাকে ত চাই—নহিলে জীবনটা যে একান্ত বিস্বাদ হইয়া যাইবে। এখন উপায়? এ অবস্থা, মাস খানেকের মধ্যেই উপস্থিত হইল।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু সে অলকার কাছে নিজ মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করে নাই। পড়ার সময় অলকার মা প্রায়ই কাছে আসিয়া বসিতেন। কেদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ সবদিন তাহার হইত না; যে সময়ে সে অলকাকে পড়ায়, সেই সময়টাই তাঁহার হেদুয়া ভ্রমণের জন্য নির্দ্ধারিত।

মাসখানেক পরে একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, অলকা বাড়ী নাই ; তাহার পিতা তাহাকে একটা ইরাজি থিয়েটারের বৈকালিক অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়াছেন।

অলকার মা আসিয়া, পড়িবার ঘরে বিনোদের কাছে বসিলেন। প্রথমে অলকার পড়াশুনার প্রসঙ্গেই কথাবার্ত্তা হইল; তার পর হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমার ত বয়স হল, বিয়ে থাওয়া করবে না ?"

বিবাহের প্রসঙ্গে বিনোদের লজ্জা হইল। সে মাথাটি নীচু করিয়া বলিল, "আমার অবস্থা সবই ত জানেন।"

"অবস্থা কি চিরদিন মানুষের সমান থাকে ? আজ বাদে কাল তুমি পাস করবে—অবস্থার কি উন্নতি করতে পারবে না ? আচ্ছা, আইন পাস করে' কোথায় তুমি প্র্যাকটিস করবে স্থির করেছ ?"

"তা এখনও স্থির করি নি। প্র্যাকটিস্ করব কি না সন্দেহ। প্রথম দু' চার বছর বসে খাবার সংস্থান ত আমার নেই। বোধ হয় আমাকে চাকরির চেষ্টাই করতে হবে।"

রাধারাণী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমাকে দেখে অবধি, একটা বাসনা আমার মনে উদয় হয়েছে! আমার ইচ্ছে হয়, তোমাকে আমার পুত্রস্থানীয় করি। তুমি আমার অলকাকে বিয়ে কর না কেন।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া, বিনোদ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। কিন্তু লজ্জায় তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। জড়িত স্বরে বলিল, "সে ত আমার আশাতীত সৌভাগ্য! কিন্তু, এখন আমার

অবস্থা কি তা ত আপনি জানেন। কেদারবাবু কি আমার মত একজন নিঃস্ব লোককে তাঁর জামাই করতে সম্মত হবেন ?”

রাধারাণী হাসিলেন। বলিলেন, “তুমি যদি রাজি থাক ত বল ; কর্ত্তার সম্মতি আদায় করে’ নেবার ভার আমার উপর রইল। তবে সব কথা তোমায় ভেঙ্গেই বলি বাবা, লুকোছাপির কোনও দরকার নেই। আমি এখন তোমার কাছে যে প্রস্তাব করলাম, তা ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছি। ওঁরও খুব ইচ্ছে যে তোমার হাতে মেয়েটিকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।”

বিনোদ অধোবদনে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। পরে বলিল, “কিন্তু দেখুন, একটা কথা আছে। অলকা বড় হয়েছেন। তাঁর মতামত—তা ছাড়া আমি উপার্জ্জনক্ষম না হলে ত—”

রাধারাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “অলকার মতের জন্যে তুমি ভেবো না। অপর কথা, কর্ত্তা পূর্ব্বে একজন প্রথম গ্রেডের ডেপুটী ছিলেন, তা বোধ হয় তুমি শুনেছ। ওঁর প্রথমপক্ষের তিনটি ছেলে, একটি ঢাকায় ওকালতী করছে, আর দুজন ভাল করে লেখা-পড়া শিখলে না, তারা দেশে থাকে, বিষয় সম্পত্তি দেখে। চীফ সেক্রেটারী সাহেব ওঁকে খুব ভালবাসেন। কর্ত্তা সেদিন বলছিলেন সাহেবকে আমি বলে রেখেছি, ছেলেদের জন্যে আমি ত কিছুই চাইলাম না, আমার যে জামাই হবে তাকে একটি ডেপুটিগিরি দিতে হবে। সাহেব বলেছেন, আচ্ছা। সেদিন সাহেবের সঙ্গে উনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মেয়ের কত বয়স হয়েছে ? উনি বল্লেন, সতেরো। শুনে সাহেব ভারী খুসী।

বল্লেন, তুমি যে মূঢ় দেশাচারের ভয়ে অন্যান্য লোকের মত ছোট বয়সে মেয়ের বিয়ে দাও নি, লেখাপড়া শেখাচ্ছ, এতে তোমার খুব সৎসাহস প্রকাশ পাচ্চে। তোমার যে জামাই হবে সে যদি বি-এ পাশ হয়, তবে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, লাটসাহেবকে বলে নিশ্চয়ই আমি তাকে ডেপুটি করে দেব। তাই আমি বলি কি বাবা, তুমি ত নিজেই নিজের কর্ত্তা, কারু মতামতের অপেক্ষা ত তোমায় রাখতে হবে না, আর বেশী দেরী না করে এই সামনে অগ্রাণ মাসেই শুভকর্ম্মটা হয়ে যাক।"

বিনোদ মনে মনে ভাবিল, "একেই বলে, বিধাতা যখন মাপায়, তখন উপরোউপরি চাপায়। আধঘণ্টা আগে অলকাকে পাবার আশাই আমার পক্ষে, বামনের চন্দ্রস্পর্শের মত দুরাশা ছিল—আর এখন শুধু অলকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটিগিরি ফাউ!"

বলা বাহুল্য বিনোদ সানন্দে সম্মতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। রাধারাণীর বারম্বার অনুরোধসত্ত্বেও জলখাবার পর্য্যন্ত সে খাইল না। ক্ষুধা বলিয়া কোন জিনিষ যে পৃথিবীতে আছে, তাহা আজ সে যেন অনুধাবন করিতেই পারিল না।

৪

কেদারবাবুর বাসা হইতে বাহির হইয়া সহসা বিনোদের মনে হইল, চলিতে তাহার পা দুখানা যেন ধূলিমলিন রাজপথে মোটেই ঠেকিতেছে না—সে যেন হাওয়ার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে; তাহার মাথার ভিতর হইতে আগুন ছুটিতেছে। নিকটে হেদুয়া পুষ্করিণী

পাইয়া, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠিক করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তীরস্থ বাগানে প্রবেশ করিল। একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দুই তিনবার হেদুয়াকে প্রদক্ষিণ করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; একবার মনে হইল বাসায় যাই। কিন্তু ছুটিতে বাসা এখন খালি, একলা সেখানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা অত্যন্ত অসহ্য হইবে; রাত্রে যে ঘুম হইবে এমন আশাও দেখা যাইতেছে না। আজ শনিবার, তার চেয়ে বরং কোনও থিয়েটারে গিয়া বসিলে, রাত্রি দুইটা অবধি একরকম করিয়া কাটিয়া যাইবে। পকেটে টাকা ছিল; বিনোদ বাহির হইয়া বীডন ষ্ট্রীটের এক থিয়েটারে গিয়া প্রবেশ করিল।

দুইটা অঙ্ক হইয়া গেলে, বিনোদ বিলক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করিল। বাহির হইয়া একটা দোকানে লুচি ডিম ও চপ খাইয়া, হাত ধুইয়া চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় তাহার এক বন্ধু প্রকাশ বাবু সেখানে দর্শন দিলেন। ইনি এক সময় বিনোদের সহপাঠী ছিলেন। বি-এ পাস করিয়া, শ্বশুরের সুপারিশে সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়াছেন। ইঁহাকে দেখিবামাত্র বিনোদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—প্রকাশকে "স্বজাতীয়" এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহার মনে হইল। মনে মনে বলিল, "তুমিও শ্বশুরের কৃপায় ডেপুটি—আমিও তাই।"

অভিনয় শেষে বাহিরে আসিয়া উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ বলিল, "এত রাত্রে বাসায় গিয়ে কি করবে? কাছেই

আমার শ্বশুরবাড়ী, সেইখানে কিছু খেয়ে, বৈঠকখানায় শুয়ে থাকবে চল।” অনেক দিনের পর বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, বিনোদ সহজেই সম্মত হইল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে, বৈঠকখানার শয্যার উপর বসিয়া উভয় বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এ কথা সে কথার পর, প্রকাশ বলিল, “কার মেয়েকে পড়াচ্ছ বলছিলে? কেদার সরকার কে?

“আগে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, এখন পেন্সন নিয়েছেন।”

প্রকাশ বলিল, “ওঃ, ডেপুটি কেদার সরকার? তাই বল! তাঁকে ত আমি জানি—অর্থাৎ অন্যান্য ডেপুটিদের কাছে তাঁর খবর শুনেছি। তিনি একজন প্রথম গ্রেডের ডেপুটি ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন ত?”

বিনোদ বলিল, “হ্যাঁ, তিনিই।”

প্রকাশ হাসিয়া বলিল, “নিশ্চয়ই তিনি। তাঁর সেই অবিদ্যা-টিকে নিয়ে এইখানেই আজকাল আছেন বুঝি?”

ইহা শুনিয়া বিনোদ চমকাইয়া উঠিল। বলিল, “অবিদ্যা কি রকম?”

প্রকাশ বলিল, “কেন হে, অবিদ্যা শুনে তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? তুমি তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করবার মৎলব টৎলব করেছ না কি?” বলিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

বিনোদ নিজেকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "না, তুমি বোধ হয় ঠিক জান না। তুমি যা বলছ, তাঁদের আচার ব্যবহারে সে রকম কোন লক্ষণই ত কোনও দিন দেখিনি আমি।"

প্রকাশ বলিল, "এখন আর কি দেখবে? এ বয়সে কি আর ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচবে? এখন যে—তপস্বিনী!"

বিনোদ ক্ষীণভাবে বলিল, "তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ। আমার ত তা মনে হয় না।"

প্রকাশ বলিল, "না হে' আমি খুব জানি। শুনেছি ওঁর স্ত্রী মারা গেছে অনেক দিন হল। সে যাক—তুমি ও প্রাইভেট ট্যুসনি জোটালে কি রকম করে বল দেখি?"

বিনোদ তখন তাহার ট্যুসনি জুটিবার ইতিহাসটুকু বলিল। গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে, তাহা গোপন রাখিল।

শুনিয়া প্রকাশ হাসিতে লাগিল। বলিল, "উঃ, বুড়ো কি কম চালাক! কেমন কৌশলটি করেছে দেখ। যুবতী মেয়েটা, তাকে পড়াবার জন্যে চব্বিশ বছরের একজন অবিবাহিত যুবক ছাড়া আর অন্য মাষ্টার খুঁজেই পেলে না! শাস্ত্রের কথা ঘি আর আগুন—বেশ জানে; কিছুদিনেই দুজনে দুজনার প্রেমে হাবুডুবু খাবে; তখন তুমি বলবে ওকেই আমি বিয়ে করব,—জাত-ফাৎ আমি ডোণ্টো কেয়ার করি। আচ্ছা, তোমায় গাঁথবার জন্যে মেয়েটাও বোধ হয় খুব উঠে পড়ে লেগেছে?"

তখন অলকার সরলতা মণ্ডিত শান্ত সংযত সুন্দর মুখখানি

বিনোদের মনে পড়িল। একটু উষ্মার সহিতই সে বলিল, "ছিঃ—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সে তা করেনি।"

প্রকাশ বলিল, "করেনি, করবে। এই ত সবে মাসখানেক যাতায়াত করছ বৈত নয়! আগে লোহা বেশ ক'রে লাল হোক, তখন ত পিটবে। সাধু সাবধান! আচ্ছা, রাত প্রায় পুইয়ে এল, এখন তুমি একটু শোও ভাই। আমি কিঞ্চিৎ নিদ্রার চেষ্টা দেখি।" —বলিয়া প্রকাশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাকী রাতটুকু বিনোদ ছটফট করিয়াই কাটাইল—নিদ্রাদেবীর কৃপালাভের জন্য সে একটুও ব্যস্ত ছিল না। আর একটু হইলেই ত না জানিয়া সে একজন ভ্রষ্টা রমণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিল! ছি ছি, তাহা হইলে কি কেলেঙ্কারীটাই হইত বল দেখি! কেদার বাবুর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

তিনি যে বাড়ী লইয়া গিয়া জলখাবার খাওয়াইয়া তাহাকে টাকা দিয়াছিলেন, সেটা তবে দয়া ধর্ম্মের অনুরোধে নহে, তাহা স্বার্থ-পরতা-প্রসূত একটা গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র! দেশ হইতে এখন খুড়িমা তাহাকে দুই মাসের টাকা পাঠাইয়াছেন। বিনোদ ভাবিল, কেদার বাবুর পঞ্চাশ টাকাই সে মণিঅর্ডার যোগে তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে এবং কুপনে লিখিয়া দিবে, সমস্তই সে জানিতে পারিয়াছে—ধর্ম্মভ্রষ্টার কন্যাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না—ডেপুটিগিরির লোভেও নয়।

কিন্তু অলকার মুখখানি মনে পড়িবামাত্র, তাহার বুকের মধ্যে দারুণ বেদনা বাজিয়া উঠিল। অলকার মা বাপের অপরাধ যতই গুরু হউক, অলকার কি দোষ? হয়ত সে জানেও না যে তাহার জনক জননীর সম্বন্ধটা অবৈধ—অপবিত্র। আর পাঁচজনের মা বাপ যেমন, তাহার মা বাপও তেমনি, ইহাই সম্ভবতঃ বালিকার বিশ্বাস। তবে, তাহার কি অপরাধ? অলকার মা যাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়—তাহা সত্যই ত! সে বিষয়ে বিনোদের মনে ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—তবে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখানে—এই অপমানে তাহার বুকটি কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? একজনের অপরাধে আর একজন সম্পূর্ণ নিরীহ প্রাণীকে শাস্তি দেওয়া কি ঘোর অধর্ম্ম নহে? আর, শুধুই কি তাহাকে শাস্তি দেওয়া? নিজকেও ত সেই শাস্তি চিরজীবন ভোগ করিতে হইবে। এই আত্মনির্য্যাতনই বা কিসের জন্য?

কিন্তু এ ভাব তাহার মনে বেশীক্ষণ আধিপত্য করিতে পারিল না। কেদার বাবুর উপর আবার তাহার বিষম রাগ হইতে লাগিল;—কেন তিনি এরূপ ভাবে তাহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিলেন? তাঁহাকে মহদন্তঃকরণ লোক বলিয়াই ত ধারণা ছিল—কিন্তু তিনি এত নীচ—ছি ছি ছি!

বিনোদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"এইবার বুঝতে পেরেছি, হিন্দুঘরের অতবড় মেয়ের এতদিন বিবাহ হয়নি কেন।—এইবার বুঝতে পেরেছি, দেশে কেন বাবুর থাকা হয় না—ছেলেরাই বা

অন্য যায়গায় থাকে কেন। বুড়ো মিন্সে—ছি ছি। আবার 'ভক্তিযোগ' পড়া হয়!"

এই মত নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোর হইয়া আসিল; কাক ডাকিতে লাগিল। ভোরের শীতল বায়ু জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া বিনোদকে তন্দ্রাতুর করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা হরণ করিল!

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বাহিরে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে, প্রকাশ বিছানার পাশে বসিয়া তাহাকে জাগাইতেছে—"ওহে ওঠ ওঠ—বেলা হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে ফেল, চা তৈরি।"

বন্ধুগৃহে চা পানান্তে বিনোদ তাহার মেসের বাসায় প্রবেশ করিবামাত্র ভৃত্যের নিকট শুনিল, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেক-ক্ষণ হইতে তাহার ঘরে বসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। চেহারা ও পোযাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যাহা উত্তর পাইল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিল, কেদার বাবু আসিয়াছেন। মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া ভাবিল, "জোচ্চোর বেটা! এসেছেন বোধ হয় সাততাড়া-তাড়ি একটা দিনস্থির করে ফেলবার মৎলবে—শেষে আসল কথা প্রকাশ পেয়ে সব ফেঁসে না যায়! আচ্ছা করে' দুকথা শুনিয়ে দিচ্চি গিয়ে দাঁড়াও।"

হঠাৎ তাহার মনে এইরূপ বীররসের আবির্ভাব হওয়াতে, সিঁড়িগুলাকে সজোরে লাথি মারিতে মারিতে সে উপরে উঠিয়

গেল। দ্বিতলে নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া, কেদার বাবুর মূর্ত্তি দেখিবা-মাত্র তাহার বীরত্ব কিন্তু অনেকখানি উবিয়া গেল। কেদার বাবুর চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত প্রশান্ত মুখমণ্ডলে যেন কি একটা বেদনার স্পষ্ট ছায়া—দেখিয়া বিনোদ কতকটা থতমত খাইয়া গেল। সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনি! আপনার শরীর কি ভাল নেই?"

কেদার বাবু বলিলেন, "না বাবা, শরীর আমার ভালই আছে। বস। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

বিনোদ সংক্ষেপে বাসা হইতে গতরাত্রে তাহার অনুপস্থিতির কারণ বলিল।

কেদার বাবু বলিলেন, "আমি কাল বিকেলে অলকাকে এম্পায়ারে ম্যাকবেথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে ত তুমি শুনেই এসেছ। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে, আমার স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুন্‌লাম।"

বিনোদ মনে মনে বলিল, "স্ত্রী! স্ত্রী বৈকি! ভণ্ডামি দেখে আর বাঁচিনে!"

কেদার বাবু বলিলেন, "সকল কথা শুন্‌লাম। শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী একটু অন্যায় করেছেন। তিনি একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমার কাছে গোপন করেছেন। তাই দুশ্চিন্তায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি। সেই বিষয়টি তোমায় জানাবার জন্যেই—"

বিনোদের মনে হইল, তবে ত প্রকাশ যাহা বলিয়াছে তাহা

মিথ্যা নহে। এই বৃদ্ধ লম্পট নিজ মুখে সে কথা স্বীকার করিতেও লজ্জা অনুভব করিতেছে না!

সে ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, বৃথা আপনি কষ্ট করেছেন। আপনার বাড়ী থেকে চলে আসবার পর ঘটনাক্রমে সে সকল কেচ্ছাই আমি জানতে পেরেছি। আপনার সেই মেয়েমানুষটিকে বলবেন—"

বৃদ্ধ হঠাৎ তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ঘূর্ণিত লোচনে বলিলেন, "খবর্দ্দার!"—বলিয়া তিনি রাগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

বিনোদ গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল, "কেন? মারবেন না কি? মশাই, আপনাকে আমি স্পষ্ট কথা বলি। আপনি আমায় ডেপুটিই করে দিন আর লাট সাহেবই করে দিন, আপনার ঐ মেয়েকে বিবাহ করে' আমি সমাজচ্যুত হতে প্রস্তুত নই।"

কেদার বাবু এবার অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলিলেন, "উত্তম কথা! কিন্তু এই কথাই তুমি ভদ্রভাবে বলতে পারতে। তুমিও জেনো, তোমার মত এমন অসভ্য দুর্ব্বিনীত চাষাকে মেয়ে দিতেও আমি প্রস্তুত নই।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

কেদার বাবু চলিয়া গেলে, বিনোদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া রহিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, দশটা বাজে, কলের জল চলিয়া যাইবে, এই বেলা স্নান করিয়া লইলে হইত। বিনোদের মাথাটা ঘুরিতেছিল, একটু শীতল জলের

আকাঙ্ক্ষায়, সে স্নান করিতে নামিয়া গেল। কলের নীচে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে স্নান করিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না।

কাল প্রায় সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়াছে। শয্যায় গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না কেবলই মনে হইতে লাগিল, "অলকাকে হারাইলাম। কি করিব, উপায় কি? এ অবস্থায় কেমন করিয়া তাহাকে বিবাহ করি? কিন্তু 'কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' আহরণ করিয়া লইতে দোষ নাই ইহাও প্রাচীন নীতিবচন। রাগের মাথায় বুড়াকে ওরূপভাবে অপমান করিয়া অন্যায় করিয়াছি। সেটা ভাল হয় নাই। নীতি ও ধর্ম্ম সকলের এক নয়। এমন হইতে পারে, ওরূপ কার্য্যকে তিনি কিছুমাত্র অন্যায় বা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হয় নাই বলিয়াই যে সে মিলন সর্ব্বদোষের সর্ব্বপাপের আকর, এমন নাও হইতে পারে। সে আকরে, অলকার ন্যায় সুপবিত্র শুভ্র সুন্দর ফুলটির উদ্ভব হইয়াছে ত! সে ফুল, বুকের কাছাকাছি পাইয়াও আমি হারাইলাম—আমার অদৃষ্টে ধিক্।"

তক্তপোষের উপর এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তায় বিনোদ বেলা চারিটা অরধি কাটাইল। তখন উঠিয়া ভাবিল, হেদুয়ার ধারে এতক্ষণ কেদার বাবু বেড়াইতে আসিয়াছেন; যাই, ওবেলার রূঢ় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসি।

জামা পরিতে গিয়া, তক্তপোষের নিম্নে নজর পড়িল, একখানা ইংরাজি খবরের কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানি তুলিয়া লইয়া দেখিল, ২০ বৎসর পূর্ব্বে লাহোর হইতে প্রকাশিত Arya Patrika সংবাদপত্র। কেদার বাবুর হাতে আজ সকালে একখানা খবরের কাগজ বিনোদ দেখিয়াছিল—তিনিই তবে এখানা ফেলিয়া গিয়াছেন। কৌতূহল বশতঃ কাগজের ভাঁজ খুলিতেই একটা সংবাদ তাহার চোখে পড়িল। সেটি আগাগোড়া বিনোদ পড়িল। পড়িয়া, জামা গায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বড় রাস্তায় পড়িয়া, হেদুয়ার দিকে প্রায় ছুটিয়াই সে চলিতে লাগিল। সেখানে তাঁহাকে না পাইয়া, তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিল। কেদার বাবুর বাড়ীতে পৌছিয়া, উপরের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি বসিয়া অলকাকে পড়াইতেছেন। বিনোদকে দেখিয়া অলকা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কেদার বাবু সবিস্ময় বিরক্তিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদ সহসা কেদার বাবুর পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "আমায় মাফ্ করতে হবে। আজ সকাল বেলা আপনার প্রতি যে আচরণ আমি করেছি, তা নিতান্ত একটা ভুল সংবাদ শুনেই করেছিলাম। এই খবরের কাগজখানি আমার ঘরে আপনি ফেলে এসেছিলেন—এইটে পড়েই আমার সেই বিষম ভুল বুঝতে পারলাম। আমাকে আপনার পুত্রস্থানীয় বলে গ্রহণ করুন আর না করুন, আমার অজ্ঞানকৃত সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।"

কেদার বাবু সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "কেন, কেন? তুমি কি শুনেছিলে বল দেখি? কার কাছেই বা শুন্‌লে?"

বিনোদ লজ্জায় অধোবদনে রহিল। তখন, প্রাতে বিনোদ কর্ত্তৃক উচ্চারিত একটা শব্দ কেদার বাবুর মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, "ওঃ বুঝতে পেরেছি। সব কথা শোন তা হলে। আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, ছেলেদের মামার বাড়ী পাঠিয়ে আমি ছ'মাসের ফার্লো নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। লাহোরে এসে, অলকার মার সঙ্গে আমার আলাপ হয়—উনি পাঞ্জাবী কায়স্থের মেয়ে ছিলেন। বাঙ্গালী কায়স্থে পাঞ্জাবী কায়স্থে বিবাহ বাঙ্গলা দেশের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অনুমোদন করবেন না জেনে, সেই দেশেই আর্য্যসমাজের আশ্রয়ে আমি ওঁকে বিবাহ করি। আর্য্যসমাজীরাও হিন্দু, কারণ তাঁরা বেদকে অভ্রান্ত বলেই স্বীকার করেন। ছুটি ফুরালে, আমি যখন অলকার মাকে নিয়ে কর্ম্মস্থানে ফিরে আসি, তখনও উনি বাঙ্গালা শেখেন নি। ওঁকে অ-বাঙ্গালী দেখে, কুলোকে আমার নামে সে সময়ে মিথ্যা গুজব রটিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি কোনও দিন তা গ্রাহ্য করিনি। অলকার মা বাঙ্গালী কায়স্থ নন, আর আমাদের বিবাহে বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্য পৌরোহিত্য করেন নি, এই কথাটা আমার স্ত্রীর উচিত ছিল কালই তোমায় জানানো। সমস্ত জেনে শুনে যদি তুমি অলকাকে বিবাহ কর ত করবে, নচেৎ তোমায় ঠকিয়ে জামাই করা আমি উচিত মনে করিনে; সেই কথা জানাইতেই আজ

সকালে আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। তুমি একটু বস, অলকার মাকে সব কথা আমি বলে আসি ; কারণ ও বেলাকার ঘটনা শুনে বাড়ীসুদ্ধ সবাইকের মন খারাপ হয়ে রয়েছে।”

সকলের মনই ভাল হইয়া গেল। বিনোদ ও অলকার মন সকলের চেয়ে বেশী ভাল হইল। অগ্রহায়ণ মাসে, এই দুই জনের মন এত ভাল হইল যে, সোহাগে গলিয়া আদরে মিশিয়া দুইটি মন একটি হইয়া গেল।

কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্তকথা

"ছোট বউ—ও ছোট বউ! ছোট বউ কৈ? ডাক্ না তাকে। থাবে কথন, রাত কি হয় নি?"

জ্যৈষ্ঠমাস, পল্লীগ্রামের রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কর্ত্তাদের এবং বাড়ীর অন্যান্য পুরুষগণের আহার সমাপ্ত হইয়াছে। রান্নাঘরে বসিয়া বড় গিন্নী হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে ঐ কথাগুলি বলিলেন। বড় মেয়ে সাবিত্রী বলিল, "কোথায় পড়ে, ঘুমুচ্চে বোধ হয়। যা ত সুরি, খুঁজে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আয়। সুরবালা গজর্ গজর্ করিতে করিতে ছোট বউকে খুঁজিতে গেল।

একতালা, দোতালা, তিনতালার ঘরে ঘরে, বারান্দায় বারান্দায়, নানা সম্ভব অসম্ভব স্থানে সুরবালা ছোট বউকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে ছাদের সিঁড়িতে উঠিল—ছাদ অন্ধকার—দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সভয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল—"ছোট বউ, ও ছোট বউ!—কুমি, ও কুমি! কুমি লো!—পোড়ারমুখী হতভাগী বাঁদরী—কৈ, এথানেও ত দেখ্ছিনে!"—বলিয়া সে নীচে নামিয়া গিয়া ছোট বউয়ের 'অপ্রাপ্তি সংবাদ' সকলকে জানাইল।

শুনিয়া, গৃহিণীরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মেঝ গিন্নী—কুমি বা কুঙ্কুমকুমারী যাঁহার পুত্রবধূ—নিজে গিয়া বাড়ীময় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না। বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, কিন্তু সন্ধ্যার পর ছোট বউকে দেখিয়াছে এমন কথা কেহই বলিল না। তখন বড় গিন্নী বলিলেন,—"ও মা, এ কি সর্ব্বনাশ হল! আমার যে বুক কাঁপছে!"

বধূদের, কন্যাদের মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীদের মনে একটা ঘোর আশঙ্কার ছায়া পড়িল। একজন উঠানের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "সদর দরজা, দুই খিড়কী দরজা—সবই ত বন্ধ!"

ছোট গিন্নী বলিলেন, "রাত দশটা বাজে, দরজা বন্ধ হবে না? সন্ধ্যার সময় ত সব দরজাই খোলা ছিল, তখন থেকেই ত সে বাড়ীতে নেই!"

কর্ত্তারা আহারান্তে তখন নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বয়স্ক পুত্রগণ কেহ কেহ বা শয়ন করিয়াছে, কেহ কেহ বা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বন্ধুবান্ধবসহ তখনও তাস পাশা চালাইতেছে। গৃহিণীরা স্থির করিলেন, কর্ত্তাদের খবর দেওয়া উচিত। বড় গিন্নী তখন হরিনামের মালা হস্তে, দ্বিতলে স্বীয় শয়নকক্ষ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ছোট বউয়ের নাম কুঙ্কুমকুমারী—বয়স এখন ১৬ বৎসর! আজ তিন বৎসর সে শ্বশুরঘর করিতেছে। পিতার নাম হারাধন

বন্ধু, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তিনি একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। এইটি তাঁহার একমাত্র কন্যা।

বাপ আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কুঙ্কুমকুমারী। কিন্তু গোড়াতেই যাহার কু, (মাঝেও কু) সে কি কখনও সু হইতে পারে? এই কারণেই হউক, অথবা জন্ম নক্ষত্রের ফলেই হউক, বাল্যকালেই কুঙ্কুম অত্যন্ত দুষ্ট ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল! পাড়ার পুকুরে পুকুরে ছিপ হাতে করিয়া সে মাছ ধরিতে ভালবাসিত, ভাইদের ঘুড়ি নাটাই লইয়া ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, প্রতিবেশীদের বাগানে বেড়া ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া স্বচ্ছন্দে গাছে উঠিয়া ফল চুরি করিয়া খাইত। এই সকল কারণে পিতামাতার নিকট কুঙ্কুমকে সময়ে প্রহারও খাইতে হইত কম নয়—এমন কি তার নামে পাড়ায় এই ছড়াই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল—

কুম্‌কুম্
তোর পিঠে দুম্ দুম্।

একদিন এক সমবয়সী বালক, কুঙ্কুমের সহিত বিবাদ করিয়া উপরিউক্ত ছড়াটি বলিতে বলিতে এবং হস্তদ্বারা দুমদুমের ইঙ্গিত করিতে করিতে তাহাকে ক্ষেপাইতে থাকে—কুঙ্কুম ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া, খুব খানিকটা ঝাকানি দিয়া, তাহাকে এমন ধাক্কা মারিয়াছিল যে, ছেলেটা টাল খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহার নাক হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে থাকে। এই সকল ব্যাপার

দেখিয়া শুনিয়া গ্রামের প্রবীণারা কুঙ্কুম সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন, তাহা সুরুচিসঙ্গত নহে; এবং সেগুলি কুঙ্কুমের পিতা মাতার কর্ণে যে মধুবর্ষণ করিত না ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পিতামাতার স্নেহ আদরে প্রতিপালিত হইয়া কুঙ্কুম ওরফে কুমি ক্রমে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণ আরম্ভ হইল। মেয়েটি দেখিতে শ্যামবর্ণ, তবে মুখশ্রী ভাল! চুল বেশ ঘন ও বড়। একমাত্র মেয়ে, বেশী দূরে বিবাহ দিতে পিতামাতার মন সরিল না। বৎসরখানেক খোঁজাখুঁজির পর একটি সুপাত্র মিলিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র নির্ম্মলকুমার। ছেলেটি গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন কলিকাতায় কলেজে এক-এ পড়িতেছে। দেখিতে শুনিতেও ভাল। শুভদিনে শুভ-লগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। কুমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে চড়িয়া শ্বশুরবাড়ী গেল।

কুঙ্কুমের শ্বশুরবাড়ী বৃহৎ বাড়ী। বাড়ীর পশ্চাতে প্রাচীর ঘেরা বৃহৎ বাগান। তাহার মধ্যে পুষ্করিণী ও বহুজাতীয় ফলবান্ বৃক্ষ। শ্বশুরেরা তিন ভাই—হরিনাথ, যদুনাথ ও কুমুদনাথ—তিন ভাই একত্র আছেন। তিন গৃহিণী, তাঁহাদের প্রত্যেকের পুত্র, কন্যা, বধূ, নাতি, নাতিনী ত আছেই, তাহা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরও অভাব নাই। চাষবাসও বিস্তৃত পরিমাণে আছে—চাকর কৃষাণ প্রভৃতির সংখ্যাও অল্প নহে। চাষের বলদ ও দোহাল গাই রাখিবার সুবিস্তীর্ণ পাকা গোহাল বাড়ীটি নির্ম্মাণে

যাহা ব্যয় হইয়াছিল, তাহাতে অনায়াসে একটি ছোট খাট গৃহস্থ পরিবারের আবাস বাটী নির্ম্মিত হইতে পারে।

শ্বশুরবাড়ীতে এই জনবহুলতা দেখিয়া কুঙ্কুমের প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিল। বউ সাজিয়া ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা হইয়াছিল। তাই সে তৃতীয় দিন বিকালে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এক সুযোগমত শ্বশুরালয় হইতে চম্পট দিল। পথঘাট তাহার অপরিচিত নহে,—প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পিতৃভবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, ধূলিধূসরিত বসনে মেয়েকে এই ভাবে গৃহে আসিতে দেখিয়া তাহার পিতামাতা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, অথবা রাগই করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বেহাই বাড়ীর দুশ্চিন্তা দূরীকরণার্থ তৎক্ষণাৎ লোক ছুটাইয়া দিলেন। অপর একজন গোরুর গাড়ী আনিতে গেল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া কন্যা সঙ্গে লইয়া পুনরায় তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পৌছাইয়া দিলেন। কুঙ্কুমের পিতা তাহার শ্বশুরগণের নিকট এবং মাতা অন্তঃপুরে গৃহিণীদের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করিয়া তাঁহাদের রাগরোষ মিটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সেই কুঙ্কুম এখন ষোল বছরের হইয়াছে। সেই এখন এ বাড়ীর ছোট বউ পদবী লাভ করিরাছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার দুষ্টামি অনেকটা কমিয়াছে বটে—কিন্তু এখনও সে আদর্শ

হিন্দু কুলবধূ হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই পাড়াতেই তাহার দুই তিনটি সখী আছে তাহারা এ গ্রামেরই মেয়ে। তাহাদের সঙ্গে কুমির বড় ভাব—তাহারা সর্ব্বদাই এ বাড়ীতে আসে। কুঙ্কুমও মাঝে মাঝে শ্বাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়। এ জন্য তাহাকে যথেষ্ট বকুনি খাইতে হয়, কিন্তু কিছুতেই তাহার এ কু-অভ্যাস দূর হইল না।

বৈশাখের শেষে গ্রীষ্মের ছুটিতে কুঙ্কুমের স্বামী নির্ম্মল বাড়ী আসিল। কয়েক দিন পরে, এই পাড়া বেড়ানো লইয়া নির্ম্মল তাহাকে খুব বকিল। স্বামী স্ত্রীতে রীতিমত ঝগড়া হইয়া গেল। নির্ম্মলের এক বন্ধু তখন দার্জ্জিলিঙে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল। বাপ মার মত করিয়া রাগের ভরে নির্ম্মলও দুই সপ্তাহের জন্য দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেল।

ইহার তিনটি দিন পরেই বাড়ীতে এই বিষম বিভ্রাট! ছোট বউ কোথায় গেল?

৩

দ্বিতলে উঠিয়া স্বামী সাক্ষাৎ জন্য বড় গিন্নী শয়ন কক্ষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। পালঙ্কের নিম্নে জল চৌকির উপর গুড়গুড়িতে তামাক সাজা রহিয়াছে—কলিকা হইতে অল্প অল্প ধূম উদ্গত হইতেছে, কিন্তু পালঙ্কে কেহ নাই। গৃহিণী দেখিলেন, সেই ঘরের কোণে একটি আমের ঝুড়ির নিকটে বড়কর্ত্তা বসিয়া আছেন, তন্মধ্যস্থ আমগুলি বাহির করিয়া আলোয় ধরিয়া একে

একে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং সুপক্ক গুলি পৃথক্ করিয়া রাখিতেছেন। এই আম বড় কর্ত্তার বড় যত্নের—গোহাল বাড়ীর সংলগ্ন যে গাছটি আছে, এগুলি তাহারই ফল। বাগানের কোনও গাছের আম এগুলির তুল্য সুস্বাদু ও সুমিষ্ট নহে। এ আমগাছে কাহারও হাত দিবার পর্য্যন্ত হুকুম নাই। কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া উপযুক্ত ফলগুলি পাড়াইয়া, নিজ শয়ন কক্ষে গুদামজাত করিয়া রাখেন এবং স্বহস্তে সাবধানে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়া দেন।

গিন্নী মুহূর্ত্তকাল কর্ত্তার কার্য্য দেখিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ওগো, এখন আম বাছা রাখ, বড় বিপদ।"

আম্র-নির্ব্বাচনে কর্ত্তা এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে স্ত্রীর কথা তাঁহার কর্ণগোচরই হইল না।

গৃহিণী এবার একটু নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ওগো শুনছ? এ দিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

কর্ত্তার তখন চমক্ ভাঙ্গিল। "কেন কি হয়েছে?" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী পুনরুক্তি করিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। ছোট বউকে পাওয়া যাচ্চে না।"

কর্ত্তা নিকটে সরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "বল কি? কখন থেকে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে ত বাড়ীতেই ছিল। বাড়ীময়

খোঁজা হয়েছে, কোথাও সে নেই। সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সন্ধ্যার পর আর কেউ তাকে দেখে নি।"

কর্ত্তা গুম্ হইয়া, নিজ কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে দুই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "গা ধুতে গিয়েছিল কি? একলা গা ধুতে গিয়ে যদি ডুবে টুবে গিয়ে থাকে! কার সঙ্গে গা ধুতে গিয়েছিল খবর নিয়েছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, তা ত নিইনি।"

কর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁ:—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি! যাও, সেইটে আগে ভাল করে জানো।"

"আচ্ছা সবাইকে জিজ্ঞাসা করে' দেখি।"—বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিতেছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আর শোন। যদুকে, কুমুদকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাও।" বলিয়া হরিনাথ বাবু বিছানায় বসিয়া উত্তেজিত চিত্তে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

এই তালার অপর প্রান্তে মেঝকর্ত্তা ও ছোট কর্ত্তার শয়ন গৃহ। বড় গিন্নী মেঝ কর্ত্তাকে খবর দিয়া, ছোট দেবরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি বিছানায় পড়িয়া এক মনে একখানি বহি পড়িতেছেন। বাঙ্গালা উপন্যাসের ইনি একজন অক্লান্ত পাঠক—স্থানীয় লাইব্রেরীর সেক্রেটারি। "চমকপ্রদ" অথবা "লোমহর্ষণ" কোন উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দেখিলেই ইনি তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরীর জন্য তাহা অর্ডার দিয়া থাকেন, এবং ভিপি আসিলে প্রথমে স্বয়ং তাহার রসাস্বাদ গ্রহণ করিয়া তার পর লাইব্রেরী

ভুক্ত করেন। বড়গিন্নী ইঁহাকে সংবাদটা দিয়া, নিয়ে আসিয়া সকল বধূ সকল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আজ কোনও দলের সঙ্গে ছোট বউ যে গা ধুইতে গিয়াছিল এমন সংবাদ পাওয়া গেল না।

তিন কর্ত্তা তখন একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বয়স্ক পুত্রেরাও আসিয়া যোগদান করিল। গৃহিণীরা, নবীনারা বাহিরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, গা ধুইতে গিয়া খুব সম্ভব সে খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া গিয়াছে; একা গিয়াছিল, তাহাতেই এ দুঃসংবাদ এতক্ষণ কেহ জানিতে পারে নাই। অথবা হয়ত বাগানে তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে, সেইখানেই সে মরিয়া পড়িয়া আছে। বাগানটা একবার ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।

পুত্রগণের মধ্যে সাহসী ও বলিষ্ঠ দুইজন, তখনই বাঁশের লাঠি ও হারিকেন লণ্ঠন লইয়া বাগানে ছুটিল। বাগান পুকুর ঘাটের চারিপাশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কোথাও কোনও চিহ্ন নাই।

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, তাঁহার সন্দেহ হয়ত কোনও দুর্বৃত্ত বদমায়েস, পাঁচিল টপকাইয়া বাগানে আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটা কেহই সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন না। মেঝকর্ত্তা—কুঙ্কুম যাঁহার পুত্রবধূ—বলিলেন, "আমর বোধ হয়

ভুলি, কি খেঁদি, কি মনোরমা, পাড়ার কারু বাড়ীতে সন্ধ্যার আগে সে বেড়াতে গিয়েছিল, কোনও অভাবনীয় কারণে আস্‌তে পারে নি। কিম্বা, হয়ত পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে।"

অনেকেই বলিলেন, এতদিন পরে, আবার পলাইয়া বাপের বাড়ী যাইবে ইহা সম্ভব কি? তবে ভুলি খেঁদি বা মনোরমাদের বাড়ী গিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেখানে আটকাইয়া পড়ারই বা কি কারণ ঘটিতে পারে? যদি হঠাৎ অসুখ বিসুখ করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি এতক্ষণ খবর দিত না?

তিন কর্ত্তায় এবং বড় গিন্নীতে মিলিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল, কিন্তু এই রাত্রে, "আমাদের ছোট বউ তোমাদের বাড়ীতে আছে কি?"—এ সন্ধান লইতে প্রতিবেশীদের গৃহে লোক পাঠানো কাহারও মত হইল না—কারণ, আর একটা অব্যক্ত আশঙ্কা সকলেরই মনে জাগিতেছিল, এখন এ সম্বন্ধে কোনওরূপ গোলযোগ করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। তবে কুঙ্কুমের পিত্রালয় গোপনে লোক পাঠাইতে আপত্তি নাই—এবং তাহা পাঠানো হইল। ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস-ভক্ত ছোট কর্ত্তা বারম্বার বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই ছোট বউ কোনও গুণ্ডা বা ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে; পুলিসে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু তাঁহার মতে কেহই মত দিল না।

রাত্রি দুইটার সময় কুঙ্কুমের পিত্রালয় হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কুঙ্কুম সেখানে যায় নাই।

সে রাত্রে বাড়ীর অনেকেই আপন শয্যায় গেল না। যে যেখানে পাইল পড়িয়া রহিল। বিষম দুশ্চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগে রাত্রি শেষ হইল।

শেষ রাত্রে বড় কর্ত্তা মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ছোট ভাই কুমুদ তাঁহাকে ডাকিতেছেন "বড়দা—বড়দা উঠুন। ছোট বউয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

বড়কর্ত্তা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ? কোথা?"

ছোট কর্ত্তা মুখখানা পেচকের মত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমার কথা তখন কেউ শুনলেন না। কে তাকে হত্যা করে, গোয়ালবাড়ীর ছাদের উপর লাস তুলে রেখে চলে গেছে।"

"অ্যাঁ! লাস তুলে রেখে গেছে! খুন করেছে? কি সর্ব্বনাশ! —তুমি কি করে জানলে?"

ছোট কর্ত্তা বলিলেন, "এই মাত্র আমি গাড়ুটি হাতে করে, মুখ হাত ধোবার জন্যে পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম। গোয়ালবাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি, ছাদের আলসের উপরটায় একখানা শাড়ীর আঁচল ভোরের হাওয়ায় ফুর ফুর করে উড়ছে। পাড় দেখেই আমি চিনতে পারলাম, ও শাড়ী ত গত মাসে আমিই ওর জন্যে কিনে এনেছিলাম।"

বড়কর্ত্তা কাপড় পরিতে পরিতে পালঙ্ক হইতে নিম্নে অবতরণ

করিয়া বলিলেন, "শুধু শাড়ী দেখেছ? তবে লাসের কথা বল্লে যে!"

ছোট কর্ত্তা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত ভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, "শুধু কাপড়খানা ছাদের উপর উঠবে কি করে বড়দা? কাপড় যখন রয়েছে, তখন লাসও নিশ্চয়ই ছাদের উপর আছে এই সবই ত ক্লু কিনা! লাসটা আল্‌সের জন্যে দেখা যাচ্ছে না।"

"চল চল, ছাদে উঠে ত দেখা যাক্।"

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, "না দাদা, অমন কাযটি করবেন না। এখন প্রথম কর্ত্তব্য পুলিশে খবর দেওয়া। লাস যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় পুলিসে এসে দেখুক। এই হচ্চে নিয়ম—তবে ঠিক সুরতহাল হবে, ডিটেক্‌টিব এসে ক্রমে খুনের কিনারা করবে। ছাদে এখন আমাদের কারু ওঠা উচিত নয়।"

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "আরে না না—কি বল তুমি! চল চল, ছাদে উঠে আগে আমরা দেখি গিয়ে।" বলিয়া কর্ত্তা শুধু পায়েই ছুটিলেন।

বাড়ীর অপর কেহ তখনও জাগে নাই—এমন কি ভৃত্যেরাও ঘুমাইতেছে। মেঝ ভাইকেও জাগাইয়া তিনজনে উঠানে নামিলেন। উঠান পার হইয়া গোহাল বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, সকলে দেখিলেন, ছাদের আলিসার উপর একখানা শাড়ীর প্রান্তভাগ বাতাসে উড়িতেছে বটে।

কিছু দূরেই একখানা মই পড়িয়াছিল। মেঝকর্ত্তা সেখানা টানিয়া আনিয়া, ছাদে লাগাইয়া তাহাতে উঠিয়া

পড়িলেন। তিনি উপরে উঠিলে, বড়কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখছ?"

মেঝকর্ত্তা বলিলেন, "ছোট বউমাই ত বোধ হচ্চে।"

ছোটকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্তের চিহ্ন আছে?"

মেঝকর্ত্তা উত্তর করিলেন, "কৈ, সে রকম ত কিছু দেখছি নে।"

"ও বুঝেছি, তা হলে অস্ত্রাঘাত করে নি। বিষ প্রয়োগ কিম্বা গলা টিপে মেরেছে।"—বলিয়া তিনিও মই বাহিয়া ছাদে উঠিয়া পড়িলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বড়কর্ত্তাও কষ্টেস্থষ্টে উঠিলেন।

তিনজনে দাঁড়াইয়া লাসের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ বড়কর্ত্তা বলিলেন, "ওহে, নিশ্বেস পড়ছে যে!" বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "ছোট বউমা! ও ছোট বউমা!"

এই শব্দে, লাস পাশ ফিরিল, চক্ষু মেলিল, এবং তিন শ্বশুরকে তথায় সমবেত দেখিয়া, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! শ্রীগুরু রক্ষা করেছেন। ওঃ"—বলিয়া দুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া ছাদের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন বহুসংখ্যক আমের আঁঠি ও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—কতক বা শুষ্ক ও পুরাতন, কতকগুলি বা সদ্যোভুক্ত। দেখিয়া তিনি এই "গুপ্ত রহস্যের" সূত্র পাইলেন।

মেঝকর্ত্তা ক্রোধের স্বরে বলিলেন, "বউমা, তুমি এখানে এলে কি করে?"

বউ নীরব—বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

বড়কর্ত্তা তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "সে সব কৈফিয়ৎ পরে হবে এখন। আমি সমস্তই বুঝতে পেরেছি। এখন তোমরা সব নামো দেখি। আমিও নেমে যাচ্চি। তারপর বউমা, তুমি আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে নেমে এস। কিছু ভয় নাই তোমার মা! কেউ তোমায় বকবে না, কিচ্ছু বলবে না। বাড়ীর লোক এখনও কেউ উঠেনি—এই বেলা নেমে এস, কেউ দেখতে পাবে না।"

মেঝকর্ত্তা ছোটকর্ত্তা নামিলেন, তৎপশ্চাৎ বড়কর্ত্তাও নামিয়া গেলেন। মই নামিতে বউমা পাছে পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় মেঝ কর্ত্তা একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। বড়কর্ত্তা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "এস এস কিচ্ছু ভয় নেই। ও সব ওদের অভ্যাস আছে।" ভাইদের লইয়া তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বড়দাদার আচরণ ও কথাবার্ত্তা উভয় ভ্রাতার নিকট প্রহে-লিকার মত বোধ হইতেছিল। তাঁহারা অবাক হইয়া, প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠের পানে চাহিয়া রহিলেন। বড় কর্ত্তা তখন বলিলেন, "কাল বিকেলবেলা, আমি যখন বাগানে যাচ্ছিলাম, দেখলাম, মইখানা গোয়ালের পিছনে লাগানো রয়েছে। দেখে বল্লাম, মইখানা এখানে কে এনে রাখলে রে! কেষ্টাকে ডেকে সেখানা সরিয়ে ফেল্লাম। তখন কি জানি যে ছোট বউমা সেই মই দিয়ে ছাদে উঠে বসে আছেন!"

এত বড় একটা "রহস্য" এত সহজে মীমাংসা হইয়া যায় দেখিয়া ছোটকর্ত্তা ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মই দিয়ে ছোট বউমা গোয়ালের ছাদেই বা উঠতে যাবেন কেন ?"

বড় কর্ত্তা বলিলেন, "কেন ? আমার পিণ্ডি চটকাতে, আর কেন ? আম খেতে উঠেছিল বোধ হয়। ছাদময় ত আমের খোলা আর আঁঠি ছড়ানো রয়েছে দেখলাম।"

এতক্ষণে বেশ ফর্সা হইল। গৃহিণীরা জাগিলেন, বাড়ীর সকলে জাগিল; সকলে ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছোটবউকে ঘিরিয়া বসিল। বড়কর্ত্তার আশ্বাস সত্বেও, বকুনি যে তাহাকে একেবারেই খাইতে হইল না এমন নহে।

ক্রমে প্রকাশ পাইল, গত দিবস বিকালে মুখুয্যেদের মনোরমা এবং কুঙ্কুম, দুজনে আম খাইবার জন্য গোয়ালের পশ্চাতে মই লাগাইয়া ছাদে উঠিয়াছিল। গোটাকতক আম খাইয়া মনোরমা নামিয়া যায়, কুঙ্কুম বলে, এই আমটা খেয়ে নামছি। নামিবার সময় সে আর মই পায় নাই। লজ্জায় কাহাকেও ডাকিতেও পারে নাই। গাছের অনেকগুলা ডাল, ঘনপল্লব ও প্রচুর ফলের ভারে অবনত হইয়া গোয়ালের ছাদ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। ডালপালা সরাইয়া ছাদের সে কোণটায় কেহ গিয়া বসিলে, নিম্নের লোক তাহাকে দেখিতে পায় না। যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ কুঙ্কুম সেই আম ঝোপের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া ছিল। বেশ অন্ধকার হইলে, আবার ডালপালা সরাইয়া বাহির হইয়া খোলা ছাদে আসে। অনেক রাত্রি অবধি সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া

থাকিবার পর, শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জেরায় ইহাও প্রকাশ পাইল যে শুধু কুঙ্কুম ও মনোরমা নহে, এবাড়ীর অন্যান্য মেয়ে ও বধূরাও মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবে ছাদে উঠিয়া গোপনে আম্রভক্ষণ করিয়া থাকে। তবে এদিন যে কুঙ্কুম ও মনোরমা আম খাইতে গিয়াছিল, একথা তাহারা জানিত না।

হীরালাল



হীরালাল জাতিতে ডোম। বৃদ্ধ হইয়াছে, বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না, আকার খর্ব্ব, দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অধিক স্থূলও নহে কৃশও নহে। কিন্তু এত বয়স হইলেও, তাহার দেহে এখনও বিলক্ষণ বল আছে; একদিনে সে অনায়াসে ১০ ক্রোশ পথ চলিতে সমর্থ, তাহার চক্ষুর জ্যোতি আজিও অটুট আছে; প্রদীপের আলোকেও ছুঁচে সূতা পরাইতে পারে।

গ্রামখানির নাম মাণিকপুর। গ্রামের যেটা ডোমপাড়া, যেখানে অন্যান্য ডোমেদের বাস, সেখানে হীরু থাকে না। গ্রামের অপর প্রান্তে, শ্মশান হইতে অল্প দূরে, একখানি মাটীর ঘরে সে একাকী বাস করে। তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার কেহই নাই; একে একে সকলেই মরিয়াছে; লোকে বলে ভূতেদের সহিত হীরুর ষড়যন্ত্র আছে। শ্মশান হইতে ভূতেরা গভীর রাত্রিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, কথাবার্ত্তা কয়। সেই কারণেই হীরু নাকি ডোমপাড়ায় থাকে না। এবং কথাবার্ত্তার অসুবিধা হয় বলিয়াই হীরুর সম্মতিক্রমে সেই ভূতেরাই নাকি উহার স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে একে একে মারিয়া ফেলিয়াছে; এবং সেই ভয়েই,

ডোমপাড়ায় হীরুর যে সকল আত্মীয় স্বজন আছে, তাহারা কেহই আসিয়া হীরুর সহিত বাস করিতে সম্মত নহে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলে, হীরুর এই ভূত অপবাদ নিতান্ত মিথ্যা কথা; তবে সে একজন গুণী লোক বটে। অনেক রকম ঔষধ তাহার জানা আছে, মন্ত্রেতন্ত্রে ঝাড়ফুঁকেও সে ওস্তাদ। অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গলে সে ঔষধ তুলিতে যায়; গোখুরা সাপ মারিয়া তাহার বিষ নিষ্কাসিত করিয়া লয়—ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহা সত্য যে পাঁচখানা গ্রামের ছোটলোক, বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য হীরুর কাছে ঝাড়াইতে অথবা ঔষধ লইতে আসে।

হীরুর ঘরখানির দুই ধারে বাঁশের দুইটি মাচা বাঁধা আছে, একটিতে রাত্রে শয়ন করে, অন্যটিতে হাঁড়ি কলসীতে তাহার চাল ডাল এবং ঔষধপত্র থাকে। বাহিরের দাওয়ার একদিকে তাহার উনান পাতা আছে। অপর দিকে সে আপন জাতিকর্ম্ম করে; কুলা ডালা ধুচুনি বুনিয়া, গ্রামে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসে।

রাত্রি তখন প্রায় ১১টা। শ্রাবণ মাস, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া চারিদিক অন্ধকার। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। হীরু ঘরের মধ্যে প্রদীপের আলোয় বসিয়া, একটা ধুচুনী বোনা শেষ করিতেছিল। দ্বার খোলা ছিল, প্রদীপের খানিকটা আলো দাওয়ার উপর গিয়া পড়িয়াছিল। হীরু হঠাৎ বাহিরে চাহিয়া দেখিল স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরা কে একজন মানুষ তাহার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছে। হীরু জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

মানুষটী আস্তে আস্তে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। পারি-ধানে একখানি কল্কাপেড়ে বিলাতী শাড়ী, ঘোমটায় মুখখানি ঢাকা। হীরু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি ?"

আগন্তুক আস্তে আস্তে সেখানে বসিল। বসিয়া অতি স্নিগ্ধস্বরে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "হীরু, তুমি বাবা, আমার একটু উপকার করবে ?"

হীরু সবিস্ময়ে বলিল, "কি উপকার বল।"

স্ত্রীলোকটি পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, "একটা ওষুধ"—বলিয়া সে চুপ করিল।

হীরু বলিল, "কিসের ওষুধ চাই তোমার ? কি ব্যারাম হয়েছে ?"

আগন্তুক একটু যেন ইতস্তত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার কাছে বিষ টিষও থাকে ত ?

হীরু সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "বিষ ? বিষ কোথা পাব ? কিছু ওষুধ বিষুধ রাখি বটে। কিসের ওষুধ চাই তোমার, তাই বল না !"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "ওষুধ না। বিষই দরকার। কেন আমার সঙ্গে ছলনা করছ হীরু ? তোমার কাছে অনেক বিষ আছে তা আমি জানি। খানিকটে বিষ আমায় দাও, বিশেষ দরকার।"

হীরু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "কেন, বিষ নিয়ে তুমি কি করবে ?"

হীরু "বিষবৃক্ষ" পড়ে নাই, ইহা মনে নিশ্চয় জানিয়া, স্ত্রীলোকটি বলিল, "শেয়ালের বড় উপদ্রব হয়েছে, বুঝেছ ! রান্না ঘরের বেড়া

ফাঁক করে, রোজ রাত্রে শেয়াল ঢুকে, আমার হাঁড়ি খেয়ে যায়। দুটো শেয়াল মরে, এই রকম খানিকটা বিষ তুমি আমায় দিতে পার ?"

হীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কেন মিছে কষ্ট করে এই আঁধার রেতে, এই জল কাদা ভেঙ্গে এসেছ তুমি ? বাড়ী যাও। ও সব কথার মধ্যে আমি কোনও দিন থাকিও নি, থাকবও না। পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হলে, তোমরা এসে আমাকেই নিয়ে টানাটানি কর কেন বল দেখি ? দুটো ওষুধ পালা জানি, তাই পাঁচজনে আমার কাছে আসে। বিষ টিষ রাখিও না, কাউকে দিইও না। কেন তোমরা মিছামিছি আমায় সন্দেহ কর ?"

রমণী বিস্মিতভাবে বলিল, "আমরা সন্দেহ করি ?"

"হ্যাঁ, তোমরা সন্দেহ কর। তুমি কে তাও আমি জানি, কি জন্যে এসেছ তাও আমি জানি।"

সভয় কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে আমি ?"

"তুমি পুলিস। তুমি পুরুষ মানুষ, ছিরিলোক সেজে এসেছ। নইলে এই আঁধার রাতে, এই শ্মশানের মোওড়ায়, ছিরিলোকের বাবার সাধ্যি কি যে আসে ?"

রমণী এই কথা শুনিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নিজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "আমি পুরুষ মানুষ ? গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছ না আমি পুরুষ কি স্ত্রীলোক ?"

হীরু বিস্মিত হইল—স্ত্রীকণ্ঠস্বরই ত বটে ! তা ছাড়া স্বরটা যেন

হীরুর পরিচিত বলিয়াও বোধ হইল। কার কণ্ঠস্বর তাহাই সে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহাকে সংশয়াপন্ন মনে করিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, "এখনও সন্দেহ? তবে দেখ!"—বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী যুবতী, কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে নিজ বক্ষের বসন সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। নষ্ট প্রকৃতি স্ত্রীলোকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

"রাম রাম!"—বলিয়া হীরু মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, "মা,বস।"

রমণী উপবেশন করিল। হীরু বলিল, "আজকাল পুলিসের ভারি উপদ্রব হয়েছে। তোমার ঘোমটা দেখে, তোমার ফিস ফিস কথা শুনে, তাই আমি সন্দেহ করেছিলাম, তুমি জাল মেয়েমানুষ, আসলে পুলিশের কোনও টিকৃটিকি।"

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল, "এখন ত তোমার সন্দেহ গেল। আমি যা চাই, আমায় দাও তবে।"—এখন আর ফিস্ ফিস্ করিয়া নহে, রমণী স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথা কহিতে লাগিল।

হীরু বলিল, "তুমি যা চাও, তা আমি তোমায় দিতে পারি। কিন্তু এ সব জিনিষের দাম খুব বেশী তা জান ত?"

রমণী বলিল, "জানি। পঞ্চাশ টাকা আমি এনেছি। এই নাও।"—বলিয়া নিজ কটিদেশ হইতে একটি "গেঁজে" খুলিয়া লইয়া, হীরুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "গুণে নাও।"

হীরু বলিল, "তোমার শেয়াল মরলে, পুলিশ এসে যখন আমায় ধরে নিয়ে যাবে, তখন ও পঞ্চাশ ত তাদের পূজো দিতেই যাবে। আরও পঞ্চাশ চাই।"

স্ত্রীলোক ক্ষুন্নস্বরে বলিল, "আরও পঞ্চাশ চাই? আর ত আনি নি। অত বেশী লাগবে তা ত আমি জানতাম না।"

"কাল টাকা এনে জিনিষ নিয়ে যেও।"

স্ত্রীলোকটি কাতর কণ্ঠে বলিল, "কাল হলে চলবে না হীরু— আজই আমার চাই যে! তা ছাড়া, কাল আমার আসবার উপায়ও নেই।"

হীরু বলিল, "সে তুমি বুঝো, কিন্তু একশ' টাকার কমে এ কায আমি পারব না বাছা, আমার সাফ কথা।"

রমণী ক্ষণকালমাত্র কি চিন্তা করিল। তার পর নিজ বাম প্রকোষ্ঠ হইতে স্বর্ণবলয় উন্মোচন করিয়া বলিল, "এই নাও। এর দাম পঞ্চাশ টাকার বেশী। দাও, আমার জিনিষ দাও।"

হীরু বালাটি হাতে লইয়া, প্রদীপের আলোকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটি পরীক্ষা করিল। তাহার পর গেঁজে হইতে টাকা-গুলি খুলিয়া সাবধানে নিঃশব্দে সেগুলি গণিয়া দেখিল ঠিক পঞ্চাশ টাকা আছে। টাকা এবং বালা মাচার উপর শয্যাতলে লুকাইয়া, অপর মাচা হইতে একটি হাঁড়ি নামাইয়া লইল। তাহার ভিতর, গাছের কতকগুলা শুষ্ক শিকড়, কয়েকটা শিশি ও অনেকগুলা ছোট ছোট পুঁটুলি ছিল। একটা শিশি আলোতে ধরিয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া, এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের উপর তাহা উপুড় করিল। কাগজে পড়িল কিসের কতকটা গুঁড়া। শিশি ছিপি বন্ধ করিয়া কাগজের মোড়ক করিয়া, রমণীর হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে দিও।"

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "এতেই হবে ত? দুটো শেয়াল মরবে?"

হীরু বলিল, "যথেষ্ট হবে।"

রমণী মোড়ক লইয়া বলিল, "এ কি?"

"শেঁখো বিষ। ভয়ানক জোর। যে শেয়ালকে খাওয়াবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তার শরীরে কলেরার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাবে। দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই শেষ। লোকে মনে করবে, সে কলেরা হয়ে মরেছে বুঝেছ? কলেরা—মনে রেখ।"

"বেশ।" বলিয়া রমণী অঞ্চলের কোণে মোড়কটি বাঁধিয়া লইল, বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া ধীর পদে বাহির হইয়া গেল।

হীরু তখন আলোকটি নিবাইয়া দিল। দাওয়ায় বাহির হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল কিছুদূরে শ্বেতবস্ত্রাবৃতা রমণী গ্রামাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। আর কয়েক পদ গিয়া রমণী দাঁড়াইল। নিকটেই একটা বটগাছ ছিল, তাহার ছায়াতল হইতে অপর একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইল। ছাতা খোলার মত খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল; তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। উভয় মূর্ত্তি অগ্রপশ্চাৎ ব্যবধানে, গ্রামের দিকে চলিল। হীরু আস্তে আস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে কুলুপ লাগাইয়া, টোকা মাথায় দিয়া পথে নামিয়া, নিঃশব্দে সেই শ্বেতবস্ত্রযুগলের অনুসরণ করিল।

সেই নিশাচর ও নিশাচরীর অনুসরণে, হীরু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুদূর গিয়া, তাহাদিগকে একটা বাড়ীর সদর দরজার তালা খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল।

হীরু তখন মনে মনে বলিল, "ওঃ, তোমায় ঠিকই সন্দেহ করিয়াছিলাম তা হলে!"

হীরু জানিত, ইহা ৺শশী মুখুয্যের বাড়ী—বুঝিল, যুবতী তাঁহারই পুত্রবধূ নীরদা।

এই বাড়ীতে হীরু মাঝে মাঝে আসিয়া, নীরদাকে কুলাটা ডালাটা বিক্রয় করে। গত দুই বৎসর যাবৎ ইহার স্বামী বিদেশে। হীরু শুনিয়াছিল, নীরদার স্বামী শীঘ্র বাড়ী আসিবে। চারি বৎসরের একটি ছেলে মাত্র লইয়া, যুবতী একাকিনী এই গৃহে বাস করে। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে একটা কাণাঘুষা আছে, হীরুও তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস করিত না। এবার তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া, আপন মনে সে বলিল, "তবে ঠিকই ত বল্‌তো লোকে! যা করছিস, করছিস্—তার উপর আবার এই! ওরে হারামজাদী!"

হীরু নিঃশব্দে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, পা ধুইয়া, এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইয়া, মাচাটির উপর উঠিয়া শয়ন করিয়া, অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতেও আকাশ তেমনি মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

মাণিকপুর গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে রেলওয়ে ষ্টেশন। বেলা সাতটার সময়, পশ্চিম হইতে একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে

দাঁড়াইল। মাণিকপুর গ্রামের ৺শশী মুখুয্যের পুত্র বিনোদলাল্‌ একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে ব্যাগ ও ছাতা হস্তে নামিয়া পড়িল। প্লাটফর্ম্মে নামিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কোনও লোক তাহাকে লইতে আসিয়াছে কি না। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে মনে বলিল, "কেইবা আছে যে নিতে আসবে! বাইরে গিয়ে দেখি যদি গোরুর গাড়ীটাড়ী একখানা পাঠিয়ে থাকে।" এই সময় বৃষ্টি আসিল। ছাতাটি খুলিয়া তখন সে টিকিট দিবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। টিকিট খানি দিয়া, বাহির হইয়া দেখিল, ষ্টেশন প্রাঙ্গণে দুইখানি গোরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও গাড়ীর গাড়োয়ানকে নিজ গ্রামের বলিয়া চিনিতে পারিল না। তথাপি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহভঞ্জন করিয়া লইল—তাহারা স্থানীয় গাড়োয়ান, ভাড়া জুটিবার আশায় ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিনোদ একবার ভাবিল, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া লয়। আবার ভাবিল, হয়ত একটা টাকা ভাড়া চাহিয়া বসিবে, সে টাকায় ছেলের জন্য, গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক হাঁড়ি রসগোল্লা কিনিতে পারা যাইবে। রৌদ্র নাই, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে? পথে কাদা হইয়াছে বটে, তা জুতা যোড়াটা খুলিয়া হাতে করিয়া লইলেই চলিবে। এইরূপ ভাবিয়া, বিনোদ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ পার হইয়া, জুতা যোড়াটি হাতে করিয়া লইয়া, নিজ গ্রামের পথ ধরিল।

এই বিনোদ লোকটির বয়স এখন ৩০ বৎসর। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট

চেহারা, চোখ দুইটি বড় বড়, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল বদন। বাল্যকালে লেখাপড়ায় বড় মন দেয় নাই। ১৮ বৎসর বয়সে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িবার সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাজারে পিতার একখানি মণিহারির দোকান ছিল, তাহার আয়েই সংসার চলিত। জমিজমা ছিল—খুব বেশী নয়—তবে সম্বৎসরের ধানটা কলাইটা তাহা হইতে পাওয়া যাইত, কিনিতে হইত না। পিতার মৃত্যুর পর দোকানখানি হাতে পাইয়া, বৎসরখানেকের মধ্যেই বিনোদ তাহা লোপাট করিয়া ফেলিল। কিছুদিন ঘরে বসিয়া রহিল; কিন্তু দিন চলে না। সংসারে যদিও দুইটি বিধবা মাত্র—মা এবং পিসিমা—তথাপি দিন গুজরাণ করা কষ্টকর হইল। প্রতিদিনের বাজার খরচ, মা পিসিমার দশমী দ্বাদশীর খরচ, তাঁহাদের ব্রত পার্ব্বণ, কাপড় চোপড়—নিজের জুতাটা জামাটা ছাতাটা সিগারেটটা, তার পরে জমিদারের খাজানা আছে—এ সব আসে কোথা হইতে? এ দিকে ছেলে 'সোমত্ত' হইল, মা পিসিমা তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু যোত্রহীন নিষ্কর্ম্মা গ্রাম্য যুবককে ভাল মেয়ে কে দিবে? এই অবস্থায় পড়িয়া, বিনোদ কলিকাতায় গিয়া অনেক চেষ্টায় একটি সামান্য কেরাণীগিরি যোগাড় করিয়া লইল। পাঁচ বৎসর সে চাকরি করিল। ইতিমধ্যে তাহার বিবাহ হইল; বেতনও কিছু বৃদ্ধি হইল। ছেলের বিবাহের বৎসরখানেক পরে, মারও বৈধব্য যন্ত্রণা শেষ হইল—একটী নাতির মুখও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

২০৲ বেতনে ঢুকিয়াছিল, ৫ বৎসরে যদিও তাহার ৩০৲ বেতন

হইয়াছে, তথাপি দুঃখ ঘুচে না। কলিকাতার মেসের খরচ, ট্রাম ভাড়া, বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়িয়া মাঝে মাঝে থিয়েটার বায়স্কোপেও যাইতে হয়, মাসে দুইবার বাড়ী যাওয়া আঁছে—বাড়ীর খরচের জন্য মাসে ৫।৭ টাকার বেশী আর দিতে পারে না। ছেলেটী হইয়াছে, তার দুধ আছে, খাবার আছে, অসুখ করিলে বিস্কুট বার্লি আছে —৫।৭ টাকায় কি করিয়া চলিবে?

এই সময় বড় বাজারে অমৃতসর-নিবাসী এক শালের মহাজনের সহিত বিনোদের আলাপ হইল। আহার ও বাসস্থান ছাড়া তিনি তাহাকে ৪০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া অমৃতসরে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কাযকর্ম্মে পটুতা দেখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের ২।১ আনার অংশীদারও করিয়া লইবেন ভরসা দিলেন। আশায় লুব্ধ হইয়া, কলিকাতার চাকরিতে ইস্তফা দিয়া, বিনোদ সেই চাকরি গ্রহণ করিল। বাড়ী গিয়া দিন দশ বারো থাকিয়া, স্ত্রীপুত্রকে পিসিমার জিম্মায় রাখিয়া, দুই বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ় মাসে বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গিয়াছিল, আর আজ ফিরিতেছে।

অমৃতসরে পৌঁছিবার মাস দুই পরেই সে পিসিমার মৃত্যু সংবাদ পায়। মাত্র দুই মাসের চাকরি, মনিব ছুটি দিল না, বলিল ইচ্ছা করিলে চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পার। বিনোদ পাড়া প্রতিবেশী অভিভাবক স্থানীয়গণকে চিঠি লিখিল; তাঁহারা একবাক্যে উত্তর দিলেন, আমরা রহিয়াছি ভাবনা কি? বউমাকে আগলাইবার জন্য একজন প্রবীণা ঝি রাখিয়া দিব, নিজেরা সর্ব্বদা দেখা শুনা করিব।—বিনোদের শ্বশুরবাড়ী গ্রাম হইতে অধিক

দূরে নহে; কিন্তু তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাই, শালারাও কেহ জীবিত নাই; বিধবা খুড়শ্বাশুড়ী তাঁহার নাবালক পুত্রকন্যাগণ সহ সেখানে বাস করেন। তথাপি বিনোদ সেই খুড়শ্বাশুড়ীকে পত্র লিখিল; তিনি উত্তর দিলেন, "সি কি হয় বাবা? তোমার বাপ পিতামহের ভিটায় সন্ধ্যা পড়িবে না এ কেমন কথা। নীরদা সেই খানেই এখন থাকুক। পরে তুমি সুবিধামত তাহাকে তোমার চাকরি স্থানে লইয়া যাইও।"—নীরদা অমৃতসর গেলে বাপ পিতামহের ভিটায় কে সন্ধ্যা দিবে, সে সম্বন্ধে কোনও সদুপায় খুড়ীমা কিন্তু নির্দ্দেশ করেন নাই।

পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেরা যত দেখা শুনা করুন আর না করুন, প্রবীণা ঝি একটি তাঁহারা যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মাস দুই পরে নীরদার সহিত ঝগড়া করিয়া সে চলিয়া যায়। একটি ঠিকা ঝি রাখা হইল, সে হাট বাজার করিয়া, বাসন মাজিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

বিনোদ বাড়ী গিয়া স্ত্রীকে লইয়া আসিবে বলিয়া মাঝে মাঝে ছুটী চাহিয়াছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের আপিস ত নহে, মহাজনী কারবার, আজ না কাল, এ মাসে না ও মাসে, এই করিয়া, এত দিনের পরে তাঁহারা বিনোদকে এক মাসের ছুটী দিয়াছিলেন।

৩

"কে রে, হীরেনাল নাকি? এখনও তুই বেঁচে আছিস?"

হীরু ডোম তাহার দাওয়ায় বসিয়া ডালা বুনিতেছিল, চাহিয়া

দেখিল, ছাতা মাথায়, জুতা ও ব্যাগ হাতে বিনোদ রাস্তায় দাঁড়াইয়া ঐরূপ চীৎকার করিতেছে।

হীরুকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদ রাস্তা হইতে নামিয়া হীরুর কুটীরের দিকে আসিতে আসিতে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "কিরে হীরু, এখনও বেঁচে আছিস্ ?"

এইবার হীরুর কথা যোগাইল—"আছি বৈকি দাদা ঠাকুর। এস, দাবায় উঠে এস, প্রণাম করি।"

বিনোদ বলিল, "পায়ে যে কাদা রে হীরু।"

বলিয়া রাস্তা হইতে নামিল। নিকটে একটা গর্ত্তে বর্ষার জল দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে পা ধুইয়া, হীরুর দাওয়ায় গিয়া উঠিল। হীরু তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য নূতন এক টুকরা বাঁশের চাটাই বিছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতদিন বাড়ী ছেড়ে কোথায় ছিলে দাদাঠাকুর ?"

"অমৃতসরে চাকরি করছিলাম রে। কেন, যাবার সময় ত তোকে বলে গিয়েছিলাম। মনিব ছুটি দেয় না, কাযেই আসতে পারি নি। এক মাসের ছুটি পেয়ে বাড়ী এসেছি।"

হীরু গম্ভীর মুখে, অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার ভাব দেখিয়া বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, "হীরু, তুই মুখখানা অমন হাঁড়ি করে বসে রয়েছিস কেন ? দুবছর পরে দেখা, একটা কথা কচ্ছিস নে। হাঁরে, আমাদের বাড়ীতে কোনও খারাপ খবর আছে না কি ? তুই আজকালের মধ্যে আমাদের ওদিকে গিয়েছিলি ? আমার ছেলে, পরিবার সবাই ভাল আছে ত ?"

হীরু গম্ভীর ভাবে বলিল, "অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয় নি।"

বিনোদ বলিল, "তা যাবি কেন! আমি বিদেশে যাবার সময় তোকে বলে গেলাম, হীরু, আমাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাবি, বউ একলা রইল, দেখবি শুনবি খোঁজ খবর নিবি। তুই বল্লি, তা আর খোঁজ খবর নেব না দাদা ঠাকুর, তোমার বাপ একদিন আমার যে উপকারটা করেছিলেন, আমি ত তোমাদের বিনি মাইনের বাঁধা চাকর। তুই এ কথা বলেছিলি কি না, বল।"

হীরু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "মাঝে মাঝে আমি গেছি বৈকি। তোমাদের বাড়ীতে না গেলেও খবরটবর পাই। বউমাকে কালও আমি পথে দেখেছি। সবাই ভালই আছে।"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা হীরু, তুই বস—আমি এখন উঠি। বাড়ীতে হয়ত তারা কত ভাবছে।"—বলিয়া বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

হীরু, বিনোদকে প্রণাম করিয়া, গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল। বিনোদ চলিয়া গেলে সে আপনার মনে বলিল, "হায়রে সংসার!"

আজ আর হীরু কুলা ডালা লইয়া গ্রামে বিক্রয় করতে বাহির হইল না। সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া রহিল, তামাক খাইল, অনেক চিন্তা করিল।

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল। যখন প্রায় বারোটা, হীরু তখন

গতরাত্রে প্রাপ্ত সেই বালা এবং টাকা পঞ্চাশটি লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, ঘর বন্ধ করিয়া, আস্তে আস্তে বাহির হইল।

গ্রামের ভিতরে গিয়া, ক্রমে বিনোদের বাড়ীর নিকট পৌঁছিল। বাড়ীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল, ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নাই, নিস্তব্ধ, কিন্তু উঠানের আমগাছে আলো পড়িয়াছে। খিড়কী দুয়ারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের একটা স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া, কৌশলে তাহার উপর উঠিয়া,হীরু নিঃশব্দে ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, রান্নাঘরের নিকটে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। হীরু ধীর পদে সম্মুখে গিয়া বলিল, "কি দিদিঠাকরুণ, এখনও ঘুমাও নি ?"

সহসা হীরুর আগমনে নীরদা ভয়ে একবারে কাঠ হইয়া গেল। কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না। হীরু বলিল, "ভয় পেয়েছ দিদিঠাকরুণ ? আমি হীরু, ভয় কি ?"

এইবার নীরদার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। সে বলিল, "হীরু, তুই চোরের মত এখানে কি করছিস ? বাড়ী ঢুকলি কি করে ?"

হীরু বলিল, "পাঁচিল টপকে এসেছি। কাল ওষুধ নিয়ে এলে, ওষুধের ফলটা কি রকম হইল তাই দেখতে এসেছি।"

নীরদা বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিল, "ওষুধ ? আমি আবার কবে তোর কাছ থেকে ওষুধ আনলাম ? কি বলছিস পাগলের মত ? মদ টদ খেয়েছিস্ বুঝি ?"

হীরু একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ন্যাকামি রাখ না দিদি-ঠাকরণ ! আমি সবই জানি। কাল রাতে তোমার গলার স্বর

শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে তুমি। তারপর, অন্ধকারে পিছু পিছু এসে, তোমাকে, আর,—তাকে এই বাড়ী ঢুকতে ত দেখেই গেলাম। সে যাক্। এখন বল দেখি, যেমন বলে দিয়েছিলাম, দুধের সঙ্গে সেই গুঁড়োটা মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছ ত?"

নীরদা দেখিল, আর ভণ্ডামি করা নিষ্ফল। বলিল, "হ্যাঁ হীরু, খাইয়ে ত দিয়েছিলাম। কৈ, এখনও ত কিছুই হল না। দিব্যি ত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।"

হীরু মৃদুস্বরে হাসিয়া বলিল, "ঘুমবেই ত। ওষুধ দিতে আমারই যে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল কি না!"

নীরদা শঙ্কিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "কেন, কি দিয়েছিস্?"

হীরু বলিল, "তুমি বিষ চেয়েছিলে ত? বিষও আমার ছিল, কিন্তু একে বুড়োমানুষ, তায় রাত্তির কাল, বিষের গুঁড়ো না দিয়ে, ভুলে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ফেলেছিলাম।"—বলিয়া হীরু ব্যঙ্গভরে আবার হাসিল।

নীরদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হীরুর মুখ পানে চাহিল। ক্রোধ কম্পিত স্বরে কহিল, "তবে তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিস্ বল? আমাকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছিস্, জোচ্চোর কোথাকার!"

এই গালি শুনিয়া হীরু রাগিয়া গেল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁলো হারামজাদি শয়তানী নচ্ছারণী! হ্যাঁ! তোকে ফাঁকি দিয়েই ত টাকা নিয়েছি। এখন আমি যে জন্য এসেছি, তা বলি শোন্। নে, তোর গয়না কাপড় বাক্স থেকে বের করে,'

পুটুলি বেঁধে নে। তোকে, আজ রাত্রেই কলকাতায় যেতে হবে।”

নীরদা বিস্মিত হইয়া বলিল, “কলকাতায়? কলকাতায় আমি যাব কেন?”

হীরু ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, “কলকাতায় যাবি নে ত কি এখানে থেকে স্বামী হত্যে ব্রহ্মহত্যে করবি হতভাগী? নে, কাপড় চোপড় গুছিয়ে নে; ভোর তিনটেয় গাড়ী। আমি তোকে ইষ্টিশনে পৌঁছে দিয়ে, টিকিট কেটে, গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে চলে আসব।”

নীরদা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল, “হীরেনাল, তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয়? তুই আমায় হুকুম করছিস? আমি যদি কলকাতায় না যাই?”

হীরু বলিল, “না যাস, এখনই বিনোদ দা' ঠাকুরকে জাগিয়ে সব কথা তাকে বলে, তাতে আমাতে দু'জনে মিলে তোকে খুন করে,' উঠোনে গর্ত্ত খুঁড়ে তোকে পুঁতে ফেল্‌বো।”

হীরুর ভঙ্গি: দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া নীরদা ভয়ে, কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, “হীরু, আমি যদি দোষ করে থাকি আমার স্বামী তার বিচার করবেন। তিনি যদি আমায় ত্যাগ করেন, তখন আমি কলকাতায় যাব—যেখানে হয় যাব। তুমি কেন এর মধ্যে—”

হীরু বলিল, “আহা, নেকু! স্বামী তোমার বিচার করবেন! বেচারি অঘোরে পড়ে ঘুমুচ্চে, তুমি যদি আজ রাতেই তার গলাটি

ছুরি দিয়ে কেটে দাও? যে বিষ খাওয়াতে পারে, সে কি আর গলা কাটতে পারে না? ওসব কথা আমি শুনবো না।' ভোর তিনটের গাড়ীতে তোমায় যেতেই হবে কলকাতা। না যদি রাজি থাক, বল, আমি সোরগোল সুরু করে দিই।"

নীরদা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। সে ধপ করিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিন্তু হীরু, কলকাতায় যে আমায় যেতে বলছ, সেখানে গিয়ে আমি কি খাব?"

হীরু বলিল, "তোমাদের দলের লোক সেখানে ঢের আছে। তারা যেমন ক'রে খায়, তুমিও সেইরকম করে খাবে।"

"কিন্তু হীরু, আমি যে কলকাতায় কখনও যাই নি, কাউকে চিনি নে। আমি কি করে সেখানে যাব, কি করে' কি করব?" —বলিয়া নীরদা চোখে আঁচল দিল।

কথাটা শুনিয়া হীরু একটুখানি ভাবিল। শেষে বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে। আচ্ছা, চল, আমি নিজেই তোমায় সঙ্গে করে' রেখে আসবো। রামবাগানে যে ডোমপাড়া আছে, সেই ডোমপাড়ায় আমাদের ক'জন আত্মীয় লোক থাকে। তাদের ধরে, তোমার একটা ঠাঁই ঠিকানা করে দিয়ে, আমি আসবো।"

নীরদা দেখিল, হীরু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার হাত হইতে নিস্তারের কোনই আশা নাই। তখন সে বলিল, "আচ্ছা, তাই চল তবে।"

হীরু বলিল, "তোমার স্বামীকে যা ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, সে

ঘুম সহজে এখন ভাঙ্গবে না। কাল বেলা ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত খুব ঘুমোবে। তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার ঘরে গিয়ে তোমার কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি গুলো বের করে নাওগে। আমি কিন্তু ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বো।"

"কেন?"

"পাছে তুমি তোমার স্বামীর গায়ে হাত দাও, কি পালাও।"

নীরদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল। হীরু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বারান্দায় উঠিয়া, ঠিক দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খাটের উপর দেখিল, ছেলেটিকে পাশে লইয়া, বিনোদ নাসিকাগর্জ্জন পূর্ব্বক অঘোরে ঘুমাইতেছে।

নীরদা বাক্স পেটরা খুলিয়া নিজ বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিয়া একটি পুটুলিতে বাঁধিতে লাগিল। হীরু বলিল, "এই নাও, তোমার বালা নাও, আর চল্লিশ টাকা—পুটিলিতে বেঁধে নাও। দশটা টাকা আমি রাখলাম পথ খরচের জন্যে।" নীরদা দ্বারের কাছে আসিয়া টাকা ও বালা লইল। পুটুলি বাঁধা হইলে, সেটী কাঁখে করিয়া হীরুর সহিত বাহির হইল।

হীরু, নীরদাকে লইয়া, প্রথমে নিজ কুটীরে আসিল। বাক্স খুলিয়া, সাফ ধুতি বাহির করিয়া পরিল, বহুকালের একটি পিরাণ ছিল তাহা গায়ে দিল, একখানি উড়ানি চাদর ছিল তাহা মাথায় বাঁধিল। জুতা পায়ে দিয়া, ছাতা লইয়া, ঘরের দ্বারে কুলুপ দিয়া নীরদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশনের দিকে চলিল।

৫

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বিনোদ স্ত্রীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণে ব্যাপৃত হইল। ছেলেটা মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে বিনোদ, অভাগিনীর পদস্খলনের বৃত্তান্ত অবগত হইল, কিন্তু সেই রাত্রে কাহার সহিত কোথায় যে নীরদা অন্তর্দ্ধান করিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এ ঘটনার পর গ্রামে আর বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বাস্তুভিটা ও জমি জমাগুলা আধা কড়িতে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া, ছুটী অন্তে ছেলেটীকে লইয়া বিনোদ অমৃতসর চলিয়া গেল। সেখানে পৌছিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিল। ছেলেটীর কষ্ট দেখিয়া, পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ মাসেই অমৃতসর-প্রবাসী একজন সদ্ব্রাহ্মণ বাঙ্গালীর কন্যাকে সে বিবাহ করিল। তদবধি বিনোদ সেইখানেই বাস করিতেছে। চাকরিতে তাহার উন্নতি হইয়াছে; নিজের একখানি বাড়ীও সেখানে নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিতে পাই।

প্রেম ও প্রহার

পদ্মাতীরবর্ত্তী রায়গঞ্জনামা এক পল্লীগ্রামে একটি খড়ে ছাওয়া মৃৎকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া, একদিন বেলা ৮টার সময় স্বামিস্ত্রীতে নিম্নলিখিত প্রকার দাম্পত্যালাপ হইতেছিল।

ভজহরি গোপ মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া, চোখ ঘুরাইয়া উচ্চস্বরে বলিল, "খপর্দ্দার মাগী মুখ সামলে কথা কোস্, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।"

মোক্ষদাসুন্দরী, স্বর আর এক পর্দ্দা তুলিয়া উত্তর দিল, "ইস্! রাগ দেখ পুরুষের! জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবেন! জুতো পাবি কোথা তাই শুনি? বাপের জম্মে জুতো কখনও পায়ে দিয়েছিস্ রে মিন্‌সে?"

দন্ত খিচাইয়া মিন্সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "চোপ রও হারামজাদী শূয়রকে বাচ্ছি! তুই আমার বাপ তুল্লি এত বড় আস্পদ্দা তোর?"

মোক্ষদা একটু দূরে সরিয়া বসিয়া বলিল, "তুলেছি, তুলেছি। ঝাঁটা তুলিনি এই তোর ভাগ্যি!"

"তোল্ না ঝাঁটা, তোর ক'গাছা ঝাঁটা আছে আমি দেখি

একবার। ঘুটে কুড়ুনীর বেটীকে বিয়ে করে এনে রাজার হালে রেখেছি, তুই আমায় ঝাঁটা দেখাবি বৈকি! নৈলে আর কলিকাল বলেছে কেন হায় রে!"

মোক্ষদা হাত উল্টাইয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "মরি মা মশারি ছিঁড়ে! কি আমার নাজার হালে নেখেচেন গো:। আমি নোকের বাড়ী ধান ভেনে, বাসন মেজে, উঠোন ঝাঁট দিয়ে যাই দুটো আনি, তাই গুবুর গুবুর চলে; নইলে ঐ বাকর কি দিয়ে ভরাতিস্ বল্ দেখি? খেটে খেটে গতর আমার জল হয়ে গেল; উনি আমায় রাজার হালে রেখেচেন। যে পুরুষ পয়সা রোজগার করতে জানে না, তার অত তেজ কেন?"

ভজহরি বলিল, "নাঃ—আমি কি আর পয়সা রোজগার করতে জানি? যত জানিস তুই! আমি গেল বছর শ্যামপুরে বাবুদের বাড়ী খানসামাগিরি করতে যাইনি? আমার খোরাক পোষাক ৫৲ মাইনে হয় নি? তখন কেঁদে কেটে অনর্থ করেছিলি কেন? 'ওগো আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না; তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ী এস, যা জুটবে তাই দুজনে দুমুঠো খাব।' কে বলেছিল রে মাগী?—নাঃ, আমি রোজগার করতে জানিনে! আমার মতন হুঁসিয়ার খানসামা এ অঞ্চলে ক'টা আছে শুনি? এ পাড়াগাঁয়ে আমাদের কদর ত কেঁউ বোঝে না, কাযেই বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়ে বসে আছি।"—বলিয়া ভজহরি কয়েক টান তামাক টানিয়া আবার আরম্ভ করিল—"আর তাও বলি—বাড়ীতে কি আমি বসেই থাকি? তুই খাটিস আর আমি খাটিনে? তুই

দুটো ক্ষুদকুঁড়ো যা হয় নিয়ে আসিস বটে, কিন্তু আমি মাছ ধরে না আনলে খেতিস্ কি দিয়ে বল দেখি? এদিকে মাছ না হলে নোলা যে একবারে খাবি খায়; একটি গেরাস ভাত মুখে ওঠে না। মনে করি খোঁটা দেবোনা, তা, তোর স্বভাবের গুণে দিতে হয়।"—বলিয়া ভজহরি ভুড়ুক ভুড়ুক করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিল।

মোক্ষদা দেওয়ালের কাছে সরিয়া বসিয়া, পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া নিজ হাঁটু দুইটিতে সকরুণ ভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "ন্যাকা মিন্‌সের ন্যাকামি দেখে আর বাঁচিনে! ভারি খোঁটার কায করেছেন কিনা! মাছ ধরে আনেন তবেই ত সংসারের সকল দুঃখুই ঘুচে গেল। কাল থেকে আমার শরীলটে খারাপ, গায়ে গতরের ব্যথায় মরে যাচ্ছি;—বল্লাম মুখুয্যেদের বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আয় ত! তাতে অমনি বাবুর অপমান হল! 'অ্যাঁ, আমি পুরুষ মানুষ হয়ে বাসন মাজবো?' আমি বল্লাম, যে পয়সা রোজগার করতে পারে না সে আবার পুরুষ মানুষ কিসের? এইত বলেছি! এতেই অমনি জুতিয়ে আমার মুখ ছিঁড়ে দিতে এলেন। এমন নোকের হাতেও আমি পড়েছিলাম, মাগোঃ—উঠ্‌তে বসতে আমায় নাতি ঝাঁটা মারে!"—বলিয়া মোক্ষদা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ভজহরি তামাক খাইতে খাইতে, স্ত্রীর পানে আড় চোখে আড় চোখে চাহিতে লাগিল। স্ত্রীর আঁখি-জলে তাহার পৌরুষগর্ব্ব টলমল করিতে লাগিল, বুঝি বা ভাসিয়াই যায়। কান্না থামে না

দেখিয়া বলিল, "বলি অত কান্না হচ্চে কিসের জন্যে? তোকে মারিও নি, কিছুই না, দুটো মুখের কথা বলেছি বৈত নয়! যাচ্ছি না হয়, বাসনগুলো মেজে দিয়ে আসছি। আর কাঁদতে হবে না, ওঠ্।"

হুঁকা দ্বারের কোণে ঠেকাইয়া রাখিয়া, ভজহরি কাছে গিয়া স্ত্রীর মুখ হইতে তাহার হস্ত ও অঞ্চল অপসারিত করিয়া লইয়া নিজ কোঁচার খুটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল। মিষ্ট কথায় তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া মুখুয্যে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মোক্ষদা তখন বলিল, "থাক্, তোমায় আর যেতে হবে না, আমিই গিয়ে বাসন ক'খানা মেজে দিয়ে আসছি। যতক্ষণ শরীলে শক্তি আছে ততক্ষণ করি, তার পর যা হয় হবে।"

ভজহরি বলিল, "তোর গায়ে গতরে ব্যথা, নাই বা গেলি তুই, আমিই যাচ্ছি। তুই এই রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে একটু শুয়ে থাক্। বাসন মেজে দিয়ে, গিন্নীমার কাছ থেকে আমি বরঞ্চ একটু তার্পিণ তেল চেয়ে আনবো, তোকে বেশ করে মালিস করে দেবো, ব্যথাটা অনেক কমবে তা হলে।"

স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ কলহ নিত্যই চলিত। মাঝে মাঝে কিলটা চড়টা চাপড়টাও যে না চলিত এমন নয়। তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে—দম্পতীর কলহ অবশেষে লঘু ক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে।

উপরে বর্ণিত ঘটনার দিন পনেরো পরে, একদিন উভয়ের কলহ

একটু সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইল না।

মোক্ষদা দুঃখধান্দা করিয়া দুই চারি পয়সা যাহা আনিত, তাহা হইতেই বাঁচাইয়া কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিত। সেই সঞ্চিত অর্থ কোথায় লুকানো থাকিত, তাহা ভজহরির অজ্ঞাত ছিল না। একদিন স্ত্রীর অনুপস্থিতি কালে, সে সেই গোপনীয় স্থান হইতে অর্থ অপহরণ করিয়া, ছিপে লাগাইবার জন্য একটি পিতলের হুইল কিনিবার অভিপ্রায়ে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী সহরে চলিয়া গেল।

হুইল কিনিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া, পুকুর ঘাটে গিয়া হাত পা ধুইয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভজহরি পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল, এমন সময় মোক্ষদা দত্তদের গোহালে সাঁজাল দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। টাকা চুরি গিয়াছে ইহা সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, এবং সন্দেহ ঠিক লোককেই করিয়াছিল। ফিরিয়া কুলঙ্গির উপরে সেই নূতন চকচকে হুইলটি দেখিবামাত্র মোক্ষদার মুখ, আগ্নেয় গিরির ন্যায়, বচনাগ্নি উদগীরণ আরম্ভ করিল। অপর পক্ষও নীরব রহিল না। অবশেষে রাগের বশে ভজহরি তাহার হুঁকা হইতে জ্বলন্ত কলিকা খুলিয়া লইয়া মোক্ষদার মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। আগুন মোক্ষদার মুখ দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বস্ত্র ও গাত্রে ছড়াইয়া পড়িল। আগুন ঝাড়িয়া ফেলিয়া মোক্ষদা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, ভজহরির হাত হইতে তাহার হুঁকাটা কাড়িয়া লইয়া তদ্দারা সজোরে তাহার মস্তকে প্রহার করিল। হুঁকার খোলটা চুরমার হইয়া গেল; জাঠ মোক্ষদার

হাতেই রহিল। বাপ্‌ বলিয়া ভজহরি মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তখন সেই জাঠ দিয়া মোক্ষদা তাঁহার পিঠে পটাপট ঘা কতক বসাইয়া দিয়া, একটু সরিয়া, চালের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল। এইবার ভজহরি কি ভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে, এবং ঐ আক্রমণ কি উপায়ে সে ব্যর্থ করিতে পারিবে ইহাই অবধারণ জন্য সে সতর্ক হইয়া রহিল।

ভজহরি কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিল না। উভয় হস্তে মাথাটি চাপিয়া ধরিয়া উহু উহু করিতে করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে উঠানে নামিল; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাঁড়া শালী হারামজাদি; তুই আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিস, আমি চল্লাম থানায় লালিস করতে। তিনটি বচ্ছর তোকে যদি আমি জেল না খাটাই ত আমি গয়লার ছেলেই নই।" - বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

ভজহরি চলিয়া গেলে, মোক্ষদা কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল। ক্রমে তাহার শ্বাসযন্ত্র সুস্থ হইলে, ধীরে ধীরে সেই খানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "সত্যিই মিন্সের মাথা ফেটেছে না কি? হুঁকোর খোলের ঘায় কখনও মাথা ফাটে?—ধেৎ! ও সব মিন্‌সের ঢঙ—ঢঙ! কিন্তু গেল কোথা? সত্যিই কি থানায় গেল না কি? হুঃ—থানায় আর যেতে হয় না। থানা প্রায় এখানে? দুকোশ দূর। এই রাত্তিরে সে আবার থানায় যাবে, তুমিও যেমন! দেখ না, এখনই ফিরে আসবে বোধ হয়।"

মনকে এই প্রকারে প্রবোধ দিয়া মোক্ষদা গৃহকার্য্যে আত্মনিয়োগ

করিল। কায করে, আর বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া দেখে স্বামী ফিরিল কি না। কায শেষ হইয়া গেল, জ্যোৎস্নাভরা উঠানের পানে চাহিয়া মোক্ষদা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়া রহিল। রাত্রি এক প্রহর হইল, দেড় প্রহর হইল, কৈ, স্বামী ত ফেরে না!

তখন মোক্ষদা স্থির করিল, নিশ্চয়ই মিন্সে থানায় গিয়াছে! মনে একটু রাগ হইল, ভয়ও হইল। 'সেপাই' আসিয়া সত্যই কি তবে তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে? মোক্ষদা উঠিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল!

ক্রমে তাহার ঘুম পাইতে লাগিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও বোধ হইল। একবার ইচ্ছা হইল, স্বামীর জন্য ভাত চাপা দিয়া রাখিয়া নিজে আহার করে। আবার ভাবিল, না থাক্, যদি আমায় ধরাইয়া দিবার জন্য সিপাই সঙ্গে করিয়াই আনে, আসিয়া দেখুক, যে স্ত্রীর সহিত সে এমন ব্যবহার করিল, সে কিরূপ পতিব্রতা, স্বামীর খাওয়া হয় নাই বলিয়া নিজে উপবাসী আছে। তাই সে না খাইয়া, রোয়াকে আঁচল বিছাইয়া শুইল এবং ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

মোক্ষদার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন গভীর রাত্রি, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, শেয়াল ডাকিতেছে। তাহার বিশ্বাস, শেয়ালেরা প্রহরে প্রহরে একবার করিয়া ডাকে—রাত্রি কি এখন দ্বিতীয় প্রহর, না তৃতীয়? ক্ষুধার যেরূপ প্রাবল্য, তৃতীয় প্রহর হওয়ারই সম্ভাবনা। থানার লোকে সম্ভবতঃ স্বামীকে বলিয়াছে, এত রাত্রে গিয়া আর কি হইবে, তুই এইখানে শুইয়া এখন ঘুমা, কাল সকালে তখন তোর বউকে ধরিতে যাইব। কাল বেলা একপ্রহর আন্দাজ সে সিপাহী

লইয়া নিশ্চয়ই আসিবে। মোক্ষদা উঠিয়া, মুখে হাতে জল দিয়া, স্বামীর জন্য ভাত তরকারি ঢাকা দিয়া রাখিয়া, অবশিষ্টাংশ নিজে লইয়া আহারে বসিল। মাছের চচ্চড়ি খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল, "আমি মাছ খেতে ভালবাসি বলেই, বড় বড় মাছ ধরে আমায় খাওয়াবে বলেই, সে হুইল কিনে এনেছিল গো! তার জন্যে তাকে অমন করে' 'নাঙ্গনা' করা আমার ভাল হয় নি।"—তাহার পর মনে হইল, 'আমি ত খাচ্চি, থানায় তাকে তারা খেতে টেতে দিয়েছে কি না কে জানে! হয় ত না খেয়েই সেখানে পড়ে আছে।'—এই কথা মনে হওয়ায় মোক্ষদার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

যাহাহউক, আহার সমাপ্ত করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, রোয়াকে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঢুলিতে লাগিল; তাহার পর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

প্রাতে উঠিয়া' নিজ কুটীরের 'বাসিপাট' সারিয়া, মোক্ষদা পরগৃহে তাহার নির্দ্দিষ্ট কায কর্ম্মগুলি করিবার জন্য বাহির হইল। সে সব সারিয়া বাড়ী ফিরিতে প্রায় দেড় প্রহর বেলা হইল। আসিবার সময় তাহার মনটা কেমন ভয় ভয় করিতেছিল, খুব সম্ভব বাড়ী গিয়া দেখিবে যে সিপাহী সহ স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। তাই বাড়ীতে সহসা প্রবেশ না করিয়া

দরজার ফাঁক দিয়া উকি দিয়া দেখিল,--কৈ, উঠানে বা রোয়াকে কেহই ত নাই!

মনিব বাড়ী হইতে মোক্ষদা দুইটি বেগুন আনিয়াছিল; ঘর খুলিয়া সে দুটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল। অন্য দিন এই সময় সে উনান ধরাইয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আজ আর রাঁধিবার জন্য তাহার কোনও ব্যস্ততা দেখা গেল না। "আমি ওঁর জন্যে রেঁধে বেড়ে রাখি আর উনি সেপাই এনে আমায় ধরিয়ে দিয়ে আরাম করে ভাত খেতে বসুন! হ্যাঁঃ—রাঁধবে না আর কিছু। অত সুখে আর কায নেই!" সুতরাং মোক্ষদা উনান ধরাইল না।

বেলা ক্রমে দুই প্রহর হইল, আড়াই প্রহর হইল; না স্বামী না সেপাই, কৈ, কেহই ত আসে না! এখন মোক্ষদার মনে হইল, তবে কি সে থানায় যায় নাই? থানায় যদি না গেল, তবে গেল কোথায়? বিবাগী হইয়া কোনও দিকে চলিয়া গেল নাকি? যদি আর ফিরিয়া না আসে?

এই সব ভাবনা চিন্তায়, দিবা অবসান হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষদা কিছুই খায় নাই। স্বামীর জন্য গত রাত্রে যে ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল; তাহাই বাহির করিয়া খাইতে বসিল। ভাবিল, স্বামী যদি আসে, তাহাকে চারিটী গরম ভাত রাঁধিয়া দিবে।

ভাত রাঁধিতে হইল না। স্বামী ফিরিল না। কাঁদিয়া কাটিয়া মোক্ষদা শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া মোক্ষদা ভাবিল, 'নাঃ; এ কোন কাযের কথা নয়। থানায় গিয়ে খবর নিতে হচ্ছে, সেখানে সে আমার

নামে নালিস করতে গিয়েছিল কি না।' তখনই ঘর দ্বার বন্ধ করিয়া, কিছু পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া থানা অভিমুখে যাত্রা করিল।

থানায় গিয়া শুনিল, কোনও গ্রামের কোনও গোয়ালা সে পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রীর নামে নালিস করিতে আসে নাই। মোক্ষদা কাতর স্বরে বলিল, "তবে দারোগা বাবু আমার স্বামী গেল কোথায়?" কবে এবং কি অবস্থায় তাহার স্বামী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, সমস্ত মোক্ষদার মুখে শুনিয়া দারোগা বাবু হুকুম দিলেন, "ওরে, সেই কাপড়ের পুঁটুলিটা মালখানা থেকে বের কর ত!"

পুঁটুলি খোলা হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ধুতি এ গামছা তুই চিনিস?"

মোক্ষদা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "এ ত তারই ধুতি তারই গামছা। তবে সে কোথায় গেল দারোগা মশাই?"

দারোগা জানাইলেন, গতকল্য প্রাতে একজন মাঝি আসিয়া এই ধুতি গামছা দিয়া গিয়াছে, এবং এজাহার করিয়াছে যে, রায়-গঞ্জের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সে রান্নার যোগাড় করিতেছিল। রাত্রি যখন আন্দাজ এক প্রহর, তখন সে দেখিতে পাইল কালো মত লম্বা মত একটা লোক, তীরে আসিয়া এই ধুতি গামছা ছাড়িয়া রাখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। লোকটা হয়ত আত্মহত্যা করিবার জন্যই ওরূপ করিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া, মাঝি নৌকা খুলিয়া জলে জলে তাহার অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে দেখিল না। তখন সেই ধুতি গামছা সে নৌকায় তুলিয়া রাখিয়াছিল।

ইহা শুনিয়া মোক্ষদা মূর্চ্ছিত হইয়া সেখানে পড়িয়া গেল।

দারোগা বাবু অনেক যত্নে ও চেষ্টায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া, "মৃতকের" নাম ধাম বয়স পেসা আত্মহত্যা করিবার কারণ প্রভৃতি জানিয়া লইয়া, তাহা ডায়েরিভুক্ত করিয়া, মোক্ষদাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

কোনও মতে স্বামীর শ্রাদ্ধ শান্তি সারিয়া মোক্ষদা সেই ভগ্ন-কুটীরেই বাস করিতে লাগিল। কোনও কায কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পেট বড় শত্রু—আবার দুঃখ ধান্দা করিতে মোক্ষদাকে বাহির হইতে হইল। মাথায় গায়ে সে আর তেল মাখে না, রুক্ষ স্নান করে, দিনান্তে একমুঠা চাউল সিদ্ধ করিয়া খায়, খাইয়া নিজ কুটীরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া শুইয়া কেবল কাঁদে। এখন কাঁদিয়াই তাহার সুখ।

কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকে তাহার এ সুখেও বাদ সাধিল। মোক্ষদার বয়স এখনও ত্রিশ বৎসরের নিম্নেই। একাকিনী বাস করে। অনেক রাত্রে বদলোকে আসিয়া তাহার দ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত এবং স্তুতি মিনতি আরম্ভ করিল। নিতান্ত অতিষ্ঠ হইলে মোক্ষদা ঝাঁটা হস্তে বাহির হইত। তথাপি শান্তি নাই—ক্রমে সে উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় একদিন ও পাড়ার কামারদের বিধবা বউ নিস্তারিণী

কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সে কলিকাতায় কোন্ বাবুদের বাড়ী ঝিগিরি চাকরি করে, বোন্‌পোর বিবাহ উপলক্ষ্যে একমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। তাহার কাছে কলিকাতার সব খবর শুনিয়া, মোক্ষদার মনে হইল, বদলোকের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের এখন একমাত্র উপায়, কলিকাতায় চলিয়া যাওয়া। নিস্তারিণী তাহাকে ভরসা দিল, একটি ভাল গৃহস্থ দেখিয়া, সেখানে মোক্ষদাকে নিযুক্ত করিয়া দিবে; কোনও কষ্ট হইবে না—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

মোক্ষদা বলিল, "কিন্তু দিদি, যে ভয়ে গাঁ ছাড়লাম, সেখানেও যদি সেই ভয় থাকে? কলকাতার লোকেরাই কি আর ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির?"

নিস্তারিণী বলিল, "সব রকম লোকই আছে। তা, তোকে এমন ভদ্র গেরস্তের বাড়ী দেখে রাখিয়ে দেবো, যেখানে সে সব আপদ বালাই থাকবে না।"

মাসান্তে, দুই একখানা তৈজস পত্র এবং সামান্য গৃহোপকরণ যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া, ঘরে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, নিস্তারিণীর সহিত মোক্ষদা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

নিস্তারিণী যে বাড়ীতে চাকরি করিত, সে বাড়ীতে অপর ঝি প্রয়োজন না থাকায়, মোক্ষদার জন্য সে একজন ভদ্র গৃহস্থ পরি-

বারের সন্ধানে রহিল। কয়েক দিন অন্বেষণের পর ঐরূপ একটী গৃহস্থের সন্ধান পাইল। শ্যামবাজারে রামদয়াল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে একজন ঝির প্রয়োজন। মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের এক-জন প্রবীণ উকিল; তাঁহার পুত্রগণ সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া পাড়ায় খ্যাতি আছে। নিস্তারিণী সেই বাড়ীতে মোক্ষদাকে লইয়া গেল।

রামদয়াল বাবুর গৃহিণী, মোক্ষদাকে অল্পবয়স্কা এবং সুশ্রী দেখিয়া প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। পরে যখন তাহার বৈধব্যের ইতিহাস, এবং গ্রামত্যাগের প্রকৃত কারণটা শুনিলেন, তখন সম্মত হইলেন। বাড়ীতে আরও দুইজন ঝি ছিল, তন্মধ্যে একটিকে বড় বধূমাতার শিশুসন্তানগুলির লালন পালনের ভার দিয়া, মোক্ষদাকে তাহার স্থানে মায় খোরপোষ ৪৲ বেতনে নিযুক্ত করিলেন।

রামদয়াল বাবুর গৃহিণী বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষিণী, এবং দয়ামায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী। তাঁহার সংসারে আশ্রয় পাইয়া, কোনও বিষয়ে মোক্ষদার কোনও অসুবিধা রহিল না। নিজ গ্রামে থাকিতে অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাহাকে যে পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইতে লাগিল; এবং মাসে মাসে তাহার বেতনের চারিটি টাকা গৃহিণী ঠাকুরাণীর নিকট জমা হইতে লাগিল।

গৃহিণী দেখিলেন, মোক্ষদা খুব পরিশ্রম করিতে পারে, মুখটি বুজিয়া আপন কায কর্ম্মগুলি করিয়া যায়, গোয়ালার মেয়ে হইলেও,

ভদ্র ঘরের বিধবাদের মতই নিষ্ঠার সহিত বৈধব্য-আচার পালন করিয়া থাকে ; তবে দোষের মধ্যে রাগটা একটু বেশী। অপর দুইজন ঝির সহিত মাঝে মাঝে সে কোন্দল করে ; গৃহিণী তখন মধ্যস্থ হইয়া, কাহাকেও বা মৃদু তিরস্কার করিয়া, কাহাকেও মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, মিটমাট করিয়া দেন।

এইরূপে মোক্ষদা তিন বৎসর এই বাড়ীতে চাকরি করিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইত, কিছুদিনের ছুটি লইয়া দিনকয়েকের জন্য নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায় ; তাহার ঘর দুয়ারের এখন কি অবস্থা তাহা দেখিয়া আসে ; কিন্তু আবার মনে হইত, আর সে শ্মশানে ফিরিয়া গিয়া লাভ কি ?

শ্রাবণ মাসে জ্বরে পড়িয়া মিত্র গৃহিণী কিছু দিন খুব ভুগিলেন, তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গেল ; দাঁড়াইলে, মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়েন। তাই পূজার ছুটির সময় রামদয়াল বাবু সপরিবারে মধুপুরে গিয়া গৃহিণীকে তিন মাস বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এক এটর্ণি বন্ধু কালীপদ বাবুও সপরিবারে মধুপুর যাইতেছিলেন,—সেখানে তাঁহার নিজ দুইখানি বাড়ী আছে, বাড়ী দুইখানি পাশাপাশি, তাহারই একখানি রামদয়াল বাবু ভাড়া লইলেন।

রামদয়াল বাবুর মধ্যম পুত্র চারুভূষণ বাবু গ্রিণ্‌লে কিওর কোম্পানীর বাড়ী কেশিয়ারি কর্ম্ম করেন ; তাঁহার ছুটি অতি অল্প দিন মাত্র, তাই তিনি সপরিবারে বাড়ীতেই থাকিবেন, অপর সকলে

মধুপুরে যাইবেন স্থির হইল। ঝিয়েদের মধ্যে মোক্ষদা ও বিমলা মধুপুরে যাইবে; কামিনী কলিকাতায় থাকিবে।

গাড়ী রিজার্ভ করা হইল। যথা দিনে রামদয়াল বাবু সপরিবারে যাত্রা করিয়া, মধুপুরে পৌছিলেন।

এটর্ণি বাবুরা তখনও পেঁাছেন নাই। বাড়ীতে পূজা, পূজা সারিয়া তবে তাঁহারা বাহির হইবেন।

কয়েক দিন মধুপুরে মোক্ষদার বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। গৃহিণী যখন বিকালে পুত্রকন্যাগণ সহ বেড়াইতে বাহির হইতেন, মোক্ষদাও তাঁহার সহিত যাইত। তিন বৎসর কাল কলিকাতায় গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল। খোলা মাঠে বেড়াইতে পাইয়া মোক্ষদা বড় আরাম বোধ করিল।

পূজার পর এটর্ণি বাবুরা সদলবলে আসিয়া পেঁাছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় গৃহিণীর সহিত বেড়াইয়া আসিয়া মোক্ষদা দেখিল, বৈঠকখানা ঘরে তার মনিব এবং পাশের বাড়ীর এটর্ণি বাবু বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। রামদয়াল বাবু বলিলেন, "আপনি তামাকখোর মানুষ; আমাদের ত ও পাট নেই;—আপনাকে একটা সিগারেট দিতে বল্‌বো কি?"—তিনি জানিতেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধাংশু সিগারেট ব্যবহার করিয়া থাকে।

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "দরকার কি? আমার গুড়গুড়িটা আনিয়ে নিচ্ছি।"—বলিয়া তিনি বাহিরের বারান্দার প্রান্তে গিয়া হাঁকিলেন, "ভজা—ও ভজা।"

পাশের ঘরে মোক্ষদা বসিয়া পাণ সাজিতেছিল, "ভজা" নামটা

শুনিবামাত্র সে কাণ খাড়া করিল। তার পর, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আবার নিজ কার্য্যে মন দিল।

দুই তিন বার ডাকাডাকির পর, ও বাড়ী হইতে সমুচ্চ স্বরে উত্তর আসিল—"আজ্ঞে।"

ও কি? কার কণ্ঠস্বর? মোক্ষদার মাথার ভিতর বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এটর্ণি বাবু হাঁকিলেন, "আমার গুড়গুড়িটে নিয়ে আয় ত ভজা!"

উত্তর আসিল, "আজ্ঞে যাই।"

মোক্ষদার আর পাণসাজা হইল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। চূণের আঙুল বস্ত্রপ্রান্তে মুছিয়া, কম্পিত পদে, দুরু দুরু বক্ষে সে বাহির হইয়া এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, যেখান হইতে বৈঠকখানা ঘরের মধ্য ভাগটি স্পষ্ট রূপে দেখা যায়।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কুণ্ডলীকৃত নললগ্ন এক প্রকাণ্ড ফরসী হস্তে এটর্ণি বাবুর ভৃত্য প্রবেশ করিল।

তাহার মুখের পানে এক নজর মাত্র চাহিয়া দেখিয়াই, মোক্ষদার হস্তপদ একবারে অবশ হইয়া আসিল। পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় সে দুই হাতে সম্মুখের দেওয়ালটায় ভর দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না; ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ভৃত্যকে দেখিয়া, বৈঠকখানা ঘরে এটর্ণি বাবু বলিলেন, "কলকে কৈ রে? তামাক সেজে আনিস নি?"

ভজা বলিল, "আজ্ঞে তা তো আপনি বলেন নি!"

এটর্ণি বাবু উকীল বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেটা গয়লার বুদ্ধি দেখলেন মশাই!" ভৃত্যকে বলিলেন, "যা তামাক সেজে নিয়ে আয়। আর, খানিকটে তামাক, গোটাকতক টিকে, দেশালাইয়ের বাক্স, এই সবও নিয়ে আয়। এবার বুঝলি ত?"

"আজ্ঞে" বলিয়া—ভজহরি প্রস্থান করিল।

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "আপনি এ রত্নটিকে পেলেন কোথা?"

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "সে মশায়, এক মস্ত ইতিহাস,—উপন্যাস বল্লেও চলে।"

"কি রকম?"

এটর্ণি বলিতে লাগিলেন, "বছর চারেক আগে, ডিস্পেপ্‌সিয়ার জন্য ডাক্তারেরা আমাকে দিন কতক ষ্টীমারে বেড়াবার পরামর্শ দিয়েছিল, না? তিন মাসের জন্যেএকটা ষ্টীম লঞ্চ ভাড়া করে, পদ্মানদীর উপর আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন সন্ধ্যার পর, ঘাট থেকে কিছুদূরে নোঙর ফেলে ডেকে বসে আমি তামাক খাচ্ছি। চাঁদ উঠেছে, জলের শোভা দেখছি; এমন সময় দেখলাম খানিক দূরে একটা মানুষ, একবার জল থেকে মাথা তুলছে, আবার ডুবছে। ষ্টীমারের দুজন খালাসিকে তখন বল্লাম—ওরে একটা মানুষ বোধ হয় ডুবে যাচ্ছে, দেখ দেখি যদি তোরা ওকে বাঁচাতে পারিস। তারা তখনি, দড়ি বাঁধা দুটো লাইফ বেল্ট নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। কাছাকাছি গিয়ে সেই বেল্ট দুটো ছুঁড়ে লোকটার কাছে ফেলে দিলে। একটা বেল্ট

সে ধরে ফেল্লে। তার পর খালাসীরা, নানা রকম কৌশল করে তাকে ষ্টীমারে এনে তুল্লে। রাম রাম—একেবারে উলঙ্গ ল্যাংটা, মশাই! খালাসীরা তাকে একটা লুঙ্গি পরিয়ে দিলে। বেটা অনেক জল খেয়েছিল, আমার সঙ্গে ডাক্তার বাবু ছিলেন, তিনি ওকে বমি টমি করালেন, ব্রাণ্ডি খাওয়ালেন, ক্রমে বেটা সুস্থ হয়ে উঠলো। তিনিই হন ঐ ভজহরি।"

রামদয়াল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে' ডুবেছিল, তা কিছু বল্লে?"

"বল্লে, বৈকি। বল্লে আমার 'ইস্তিরী' মারা গেছে, সেই 'শোগে' আমি আত্মহত্যা কর্‌ছিলাম। কাপড় কি হল জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, 'কাপড় গামছা ডাঙ্গায় রেখে আমি জলে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। ভাবলাম, আমি ত মরছিই, ধুতিখানা গামছাটা এখানেই ফেলে রাখি, কোনও গরীবে কুড়িয়ে পেয়ে পরে বাঁচবে।"

রামদয়াল বাবু বলিলেন, "অদ্ভুত!"

এটর্ণি বাবু বলিলেন, "অদ্ভুত বৈকি! আমি ভাবলাম, একাধারে এত পত্নীপ্রেম, আর এত বিশ্বপ্রেম ত দেখা যায় না! একে হাতছাড়া করা হবে না। চাকর স্বরূপ ষ্টীমারেই ওকে রাখলাম। মাস খানেক পরে কলকাতায় ফিরে এলাম। তার পর, ওর আমি বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, বলেছি টাকা দিচ্ছি, দেশে গিয়ে আবার বিয়ে থাওয়া করে' আয়। তা বেটা কিছুতেই রাজি হয়না। বলে, যার মুখে আগুন দিয়েছি, তাকে যে ভুলতে পারিনি হুজুর! বিয়ে আর আমি করবো না!"

রামদয়াল বাবু বলিলেন, আশ্চর্য্য মানুষ ত !”

“আশ্চর্য্য বৈ কি !”

মোক্ষদা পূর্ব্ব স্থানেই ছিল, কিন্তু এসকল কথাবার্ত্তার একটী বর্ণও সে শুনিতে পায় নাই। মৃত স্বামীকে জীবিত মূর্ত্তিতে দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মোক্ষদার সহিত ভজহরির গোপনে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে—কিন্তু কোনও পক্ষের মনিব পরিবারকে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানানো হয় নাই। মোক্ষদার ভারি লজ্জা করে—ছিঃ এতদিন বিধবার মত থাকিয়া কেমন করিয়া বলিবে ও বাড়ীর ঐ ভজা আমার স্বামী! লোকে যদি অবিশ্বাস করে, তখন সাক্ষী প্রমাণ কোথায় পাইবে? ভজাও তাহার মনিবকে বলিতে সাহস করে না—তিনি শুনিলেও হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না ; হয়ত ভাবিবেন, ও বাড়ীর ঐ সুশ্রী ঝিটার উপর তাহার লোভ পড়াতে ছুঁড়িকে রাজি করিয়া এই মিথ্যা দাবী উপস্থিত করিয়াছে ; এবং জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দিবেন।

এখন আর মোক্ষদা গৃহিণীর সহিত বিকালে বেড়াইতে যায় না ; উভয় বাটীর লোকে বেড়াইতে বাহির হইলে সে স্বামীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করে ; এবং মাঝে মাঝে সে সুযোগ পাইয়াও থাকে। উভয় বাটীর বাগানের সীমানার পশ্চাদ্‌ভাগে একটা মস্ত কামিনী ফুলের ঝাড় আছে, তাহার আড়ালে বসিয়া উভয়ে প্রায়ই কিছুক্ষণের জন্য কথাবার্ত্তা কহে।

প্রথম দিন মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হ্যাঁরে, তুই এমন কায কেন করতে গিয়েছিলি বল দেখি ?"

ভজা বলিয়াছিল, "থানায় যাচ্ছি বলে' তোকে শাসিয়ে সেই যে বাড়ী থেকে বেরুলাম ;—বুঝলি মুখী, খানিক দূরে গিয়ে ভাবলাম, তুই হলি আমার আপন ইস্তিরী তোকে জেলে দেওয়াটা ত ভাল হবে না, লোকে শুন্‌লে বলবে কি ? গায়ে থুঁতু দেবে যে ! তার চেয়ে বরং অন্য রকমে তোকে জব্দ করাই ভাল। মাছ খেতে তুই বড্ড ভালবাসিস, মাছ না পেলে ধড়ফড়িয়ে মরিস, তাই ভাবলাম, দাঁড়া তোকে জব্দ করছি। তোকে বিধবা করে তোর মাছ খাওয়া বন্ধ করছি শালী !'—এই ভেবেই, ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে পদ্মায় গিয়ে ঝাপ দিয়েছিলাম।"

"ধুতি গামছা ডাঙ্গায় ছেড়ে রেখে গিয়েছিলি কেন ?"

"গাঁয়েরই ঘাট ত ! সেই ধুতি গামছা ওখানে দেখে, কেউ না কেউ চিনতে পারবে—আমার নাস যদি ভেসে নাও ওঠে, তা হলেও বোঝা যাবে যে জলে ডুবে আমি আত্মহত্যে করেছি। তবে ত তোর মাছ খাওয়া বন্ধ হবে !"

মোক্ষদা বলিল, "তোর কি বুদ্ধি রে ! আচ্ছা যখন দেখলি যে বেঁচে আছিস্‌, তখন বাড়ী এলিনে কেন ?"

"চাকরি করছিলাম যে ! ভেবেছিলাম, মাস কতক চাকরি করে' কিছু টাকা জমিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবো আমি রোজগার করতে পারি কি না। দেশে গিয়ে শুনলাম, তুইও কলকাতায় এসেছিস চাকরি করতে। সেই অবধি কত জায়গায় যে তোকে

খুঁজেছি তার ঠিক নেই। কারু বাড়ীর ঝিকে পথে ঘাটে দেখলেই অমনি তার পিছু নিয়েছি। জিজ্ঞাসা করেছি হ্যাঁগা, রায়গঞ্জের মোক্ষদা গয়লানী কোথায় ঝি গিরি চাকরি করে জান কি? কেউ বল্‌তে পারে নি।"

পরদিন বিকালে যখন কামিনী ঝাড়ের আড়ালে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন ভজহরি কলাপাতায় জড়ানো একখণ্ড ভাজা মাছ বাহির করিল দেখিয়া মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, "মাছ আনলি কোত্থেকে?"

ভজহরি বলিল, "আজ চার বচ্ছর তুই মাছ খেতে পাসনি—আহা তোর কত কষ্ট হয়েছে! তাই তোর জন্যে এনেছি।"

"কোথা পেলি?"

"বামুন ঠাকুর আজ ভাতের সঙ্গে আমায় যে মাছ দিয়েছিল. সে মাছ আমি খাইনি, তোর জন্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নে, খা।"—অল্প দূরেই একটা খাল ছিল। মোক্ষদা চারি বৎসর পরে স্বামীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, সেই খালের জলে হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, আবার গল্প করিতে বসিল।

প্রায় প্রতিদিনই উভয়ের এইরূপ সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম ২।৪ মিনিটের অধিক উভয়ে একত্র থাকিত না। ক্রমে সাহস বাড়িয়া গেল, অন্ধকার হইয়া যাওয়ার পরও বসিয়া থাকিত।

উভয়ের বিরহাবস্থার সম্পূর্ণ বর্ণনা পরস্পরের নিকট তাহারা করিয়াছে। ক্রমে তাহাদের পরামর্শ হইয়াছে যে, এখন বিদেশে বিদায় চাহিলে তাহা মঞ্জুর হইবে না, মাস দুই পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, উভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবে, এবং উভয়ের

সঞ্চিত অর্থে গুটিকয়েক গাভী কিনিয়া, বাড়ীতে বসিয়া জাতি ব্যবসায় আরম্ভ করিবে।"

প্রথম সাক্ষাতের দশবারো দিন পরে, একদিন যথানিয়মে যথাস্থানে দুইজনে মিলিত হইল। কলিকাতা হইতে ভজার মনিবের ইলিশ মাছ আসিয়াছিল। বামুন ঠাকুরের খোসামোদ করিয়া বেশ বড় একখানা পেটীর মাছ সেদিন ভজা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মাছ বাহির করিয়া বলিল, "খাসা মাছ রে! যখন ভাজছিল, গন্ধে বাড়ী মাত করে দিয়েছিল। কত বড় পেটিখানা তোর জন্যে এনেছি দ্যাখ্ দ্যাখ্। আজ আমার সাধ হয়েছে আমি হাতে করে তোকে খাইয়ে দেবো। কাছে সরে আয়, হাঁ কর্।"

মোক্ষদা হাসিয়া স্বামীর কাছটি ঘেঁসিয়া বসিল। ভজা আদর করিয়া বাম হস্তে স্ত্রীর গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে মাছ খাওয়াইতে লাগিল।

কিন্তু এ দাম্পত্য লীলায় সহসা বাধা পড়িল। পশ্চাদ্দেশে কাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে, ভজহরি হুমড়ি খাইয়া বিপুলবেগে মোক্ষদার গায়ের উপর পড়িয়া, উভয়েই ধরাশায়ী হইল। চমক ভাঙ্গিলে, উভয়ে চোখ চাহিয়া দেখিল, এটর্ণি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র বাবু, বীরবিক্রমে রক্তনেত্রে চাহিয়া আছেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র মোক্ষদা এঁটো মুখে ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অবিলম্বে সেখান হইতে পলায়ন করিল। ভজহরিও কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। বীরেন্দ্র বাবু ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তবে রে হারামজাদা! ভারি যে সাধুগিরি

ফস্নাতিস্!" বলিয়া তাহার গালে ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা থাপ্পড় কষাইয়া দিলেন।

ভজহরি হস্ত দ্বারা সে প্রহার রোধ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হুজুর, মারেন কেন? ও যে আমার ইস্তিরী—আপন বিয়ে করা ইস্তিরী হুজুর।"

বাবু বলিতে লাগিলেন, "তোর বিয়ে করা ইস্তিরী বৈকি পাজি নচ্ছার শুয়ার! সে ত কবে মরে গেছে! ও ছুঁড়িটাকে আমি কি চিনিনে মনে করেছিস? ও তো উকীল বাবুর ঝি—বিধবা মানুষ! আর বদমাইসির জায়গা পেলিনে হতভাগা গাধা! ক'দিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছে। সন্ধ্যেটি হলেই তুইও দেখি এ দিকে আসিস্, আর ও বাড়ীর ঐ ঝি হারামজাদীও এই দিকে আসে। তাই আমি তক্কে তক্কে থেকে আজ এসে ধরেছি। চল্ বাবার কাছে, সব কথা গিয়ে তাঁকে বলি, রাস্কেল, তিনি তোর কি শাস্তি করেন দ্যাখ্।"—বলিয়া বীরেন্দ্র বাবু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন। ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতে, কোমরটি দুই হাতে ধরিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উভয় বাটীর লোকেরা বৈকালিক ভ্রমণ হইতে ফিরিবামাত্র, কথাটা তাঁহাদের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভজহরি যে মোক্ষদাকে স্ত্রী বলিয়া দাবী করিতেছে, তাহাও তাঁহারা শুনিলেন। মিত্র গৃহিণী ও বড়বধূর নিকট মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই খুলিয়া বলিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন; কিন্তু উভয় বাটীর পুরুষেরা উহা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।

তখন রামদয়াল বাবুর বৈঠকখানায় ভজহরির বিচারের জন্য ফুলবেঞ্চ বসিল। এটর্ণি বাবু বলিলেন, "এর মীমাংসা ত সহজেই হতে পারে। ওহে সুধাংশু! দুজনাকে তুমি আলাদা আলাদা জেরা কর না! ওদের কথা যদি মিথ্যে হয় জেরায় কতক্ষণ টিকিবে?"

সুধাংশু বাবু তাহাই করিলেন। মোক্ষদাকে অন্তঃপুরে নিজ স্ত্রীর জিম্বায় বসাইয়া রাখিয়া, ভজহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পদাঘাত জনিত কোমরের ব্যথায় কাতরাইতে কাতরাইতে সে আসিয়া মেঝেয় বসিল। সুধাংশু বাবু তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করিলেন যথা—তোদের বাড়ীতে ক'খানা ঘর, কোন্ কোন্ মুখো ঘর, কোন্ ঘরে কি কি থাকৃত, যে পুকুরে তোরা জল সরতিস, সে পুকুর বাড়ীর কোন দিকে, তার কটা ঘাট, সে পুকুরে যেতে হলে কোনও গাছের তলা দিয়ে যেতে হয় কি না, সেগুলো কি কি গাছ, যাদের বাড়ীতে মোক্ষদা কাযকর্ম্ম করত, তাদের নাম কি?—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভজহরির উত্তরগুলি সুধাংশু বাবু লিখিয়া লইলেন।

তার পর মোক্ষদার ডাক পড়িল। তাহাকেও অবিকল ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হইল। উভয়ের উত্তরে বিশেষ কোনও পার্থক্য পাওয়া গেল না। ভজহরি তখন স্ত্রীর উপর সত্ত্ব সাব্যস্তের ডিক্রী পাইল।

যতদিন মধুপুরে থাকা হইবে, ততদিন এই দম্পতীর বাসের জন্য মিত্র গৃহিণী তাঁহার বাসার আস্তাবলের পার্শ্বস্থ কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই পরামর্শে, শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মোক্ষদা একটা বাটীতে কর্পূর মিশানো খানিকটা তার্পিণ তৈল

লইয়া গিয়া, স্বামীর ব্যথিত কোমরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে ম্যালিস করিয়া দিল।

একমাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, উভয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া, সঞ্চিত অর্থ লইয়া দেশে চলিয়া গেল। তথায় কুটীরখানির জীর্ণসংস্কার করিয়া, একটি গোহাল ঘর তুলিয়া, গাভী কিনিয়া, জাতি ব্যবসায় সুরু করিয়া দিল। দুধে যে কি পরিমাণ জল স্বচ্ছন্দে মিশানো যাইতে পারে, সে বিষয়ে উভয়ের কলিকাতার অভিজ্ঞতা খুব কাযে লাগিয়া গিয়াছিল।

ঔপন্যাসিক



কলিকাতার কোনও একটী মেসের বাসায়, নবীন ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রবাবু বসিয়া তাঁহার নূতন উপন্যাসের শেষ প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। ভাদ্রমাস, রবিবার, বেলা নয়টা, আকাশে মেঘ থমথম করিতেছে, একটুও বাতাস নাই, মাঝে মাঝে তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া প্রুফশীটের উপর পড়িতেছে। মাঝে মাঝে প্রুফগুলার উপর দোয়াত চাপা দিয়া, পার্শ্বস্থ পাখা খানা উঠাইয়া লইয়া নগেন্দ্র বাবু নিজেকে বাতাস করিতেছেন;—আবার সংশোধন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন। সম্মুখে পূজা, বহিখানি এই সপ্তাহেই বাহির করা প্রয়োজন!

এই নগেন্দ্র বাবুর বয়স এখন ২৬ বৎসর মাত্র। নিবাস, পাবনা জেলার কোনও এক দূর পল্লীগ্রামে। আই-এ পরীক্ষায় একবার ফেল করিয়া, আর পড়িবার সঙ্গতি হয় নাই—বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না—অনেক চেষ্টা চরিত্র ও সহি-সুপারিসের বলে গ্রিন্‌লে ফিণ্ডর কোম্পানির আপিসে চারি বৎসর হইল সামান্য বেতনে কেরাণী-গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এখন বেতন ও পদবৃদ্ধি হইয়াছে। অসচ্ছল অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া, দেশস্থ আত্মীয়গণের প্রবল অনুরোধ সত্ত্বেও আজি বিবাহ করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্র বাবুর মনে ঔপন্যাসিক হইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। চাকরিতে ভর্ত্তি হইয়া প্রথম বৎসরে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া, মাসিকপত্রে প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও সম্পাদকই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। এই কারণে বৎসর খানেক ধরিয়া তিনি ভগ্নোত্থম হইয়া বসিয়া ছিলেন। তার পর বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের "আর্ট"-এর যুগ আরম্ভ হইল; এবং যাঁহারা "আর্ট" মূলক উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পুস্তক (বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়গামী বালক ও তরুণ যুবকগণের মধ্যে) হু হু করিয়া বিকাইতে লাগিল। এই উপন্যাসগুলি, নানা কাগজে যতই "অশ্লীল" বলিয়া গালি খাইতে লাগিল, ততই ইহাদের কাট্‌তি বাড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া, নগেন্দ্র বাবুও আবার খাতা বাঁধিলেন। ৩।৪ মাস পরিশ্রম করিয়া আর্টমূলক একখানি উপন্যাস লিখিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এমন কোনই মূল্যবান জিনিষ নহে, যাহার জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সতীত্ব বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, তাহার মূলে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নাই। শাস্ত্র ও সমাজে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া এতকাল স্ত্রীজাতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, এ নূতন আলোর যুগে আর তাহা চলিবে না। পুরুষের যেমন যা-খুসী করিবার অধিকার আছে, স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ অধিকার থাকাই ন্যায়সঙ্গত—ইত্যাদি। লিখিলেন বটে, তাহাতে আর্টও কিছু রহিল বটে, কিন্তু আর্টের "নগ্নচিত্র" তাহাতে

তেমন ভাল ফুটিল না। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে, কতকটা লেখাপড়াও শিখিয়াছেন, তাই একটু সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, একজন উদ্যমশীল প্রকাশক বহিখানি ছাপাইবার ভার লইলেন; পুস্তকের মধ্যে আর্টের যেটুকু অভাব ছিল, প্রকাশক তাহা বিজ্ঞাপনের দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, বৎসর না ঘুরিতেই প্রথম সংস্করণ কাটাইয়া দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। কিছু টাকাও নগেন্দ্র বাবুর পকেটগত হইল।

এইরূপে উৎসাহ পাইয়া, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার এই তৃতীয় উপন্যাস-খানি রচনা করিয়াছেন। এবার, পূর্ব্ব সঙ্কোচ অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন—বেশ "নির্ভীক" ভাবেই এবার আর্টের "নগ্নচিত্র" অঙ্কিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের মূর্খ অন্ধ সমাজ যাহাদিগকে পতিতা বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই যথার্থ স্বর্গের দেবী—তাহাদের হৃদয়গুলি কুসুমের মত কোমল ও পবিত্র—দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্ম-মর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে তাহারা ভূষিত; অপর পক্ষে গৃহস্থ মেয়েদের মন অতি নীচ, অতি সঙ্কীর্ণ; তাহারা নিতান্ত স্বার্থপর, ক্রোধী, কটুভাষিণী—এক কথায়, তাঁহাদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী।

নগেন্দ্র বাবু বসিয়া বসিয়া প্রুফ দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে দশটা বাজিল, সাড়ে দশটা বাজিল। ঝি আসিয়া স্নানের জন্য তাগাদা জানাইল; নগেন্দ্র বাবু সে কথা কাণে তুলিলেন না। ক্রমে সুধীর নামক একজন সুদর্শন যুবা আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে

আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলি, "দাদা, আর বাকী কত?" —সুধীরও এই বাসাতেই থাকে।

নগেন্দ্র বাবু অসংশোধিত কাগজগুলি গণিয়া বলিলেন, "আর চার শীট আছে।"

সুধীর বিনীত স্বরে বলিল, "স্নান আহার করে' ওগুলো দেখলে হত না?"

নগেন্দ্র বলিল, "দেরী হয়ে যাবে যে ভাই। আজকেই তারা পেজ বেঁধে অর্ডার প্রুফ দেবে বলেছে, সেই জন্যেই আজ রবিবার হলেও ছাপাখানায় লোক বের করেছে। কালই তারা ছাপা শেষ করতে চায়। বইখানা যাতে এই হপ্তার মধ্যে বেরিয়ে যায়, তার জন্যে প্রকাশক তাদের কড়া তাগাদা দিচ্ছেন।"

সুধীর বলিল, "আচ্ছা দাদা, এক কায করুন না। আপনি স্নানাহার করতে যান, প্রুফ যতগুলো দেখা হয়েছে, আমি এখনই গিয়ে ছাপাখানায় দিয়ে আস্‌ছি। ততক্ষণ তাদের কায চলুক। বলে' আসবো, আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বাকীটুকু দিয়ে যাব।"

নগেন্দ্র বলিল, "এই রোদ্দুরে দু'দুবার তুমি সেই দর্জ্জিপাড়া হাঁটাহাঁটি করবে? তার চেয়ে বরঞ্চ, আধঘণ্টা খানিক বস, শেষই করে দিই—একেবারে নিয়ে যেও।"

সুধীর বলিল, "না দাদা, দু'বার প্রেসে যেতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আপনি উঠুন, স্নান করে' ভাত খান। কলের জল ত বহুক্ষণ চলে গেছে, চৌবাচ্চার জলও তলানি পড়ে গেছে। ভাতও প্রায় শুকিয়ে উঠলো।"

এই সুধীর কলেজের একজন ছাত্র এবং নগেন্দ্র বাবুর একজন পরম ভক্ত। কেহ নগেন্দ্রনাথের লেখা নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিলে সুধীর তাহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্কে লাগিয়া যায়; বলে, "তোমরা সব পেঁচার জাত, এতকাল অন্ধকারেই অভ্যস্ত ছিলে; এখন সাহিত্যের এই নবযুগের আলো দেখে কিচির মিচির আরম্ভ করেছ।" আরও কত কি বলে।

ভক্তের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, নগেন্দ্র উঠিল। সংশোধিত শীটগুলির পত্রাঙ্ক মিলাইয়া, পিনে গাঁথিয়া, সুধীরের হস্তে দিয়া, স্নানার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুধীর প্রুফগুলি লইয়া প্রেসে দিতে গেল।

২

নগেন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস "সমাজদ্রোহী" প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তাহ খানেক পরে, আফিসের ফেরৎ একদিন বিকালে নগেন্দ্র তাহার প্রকাশকের দোকানে আসিয়া দর্শন দিল। প্রকাশক মহাশয় তখন তাঁহার খাসকামরায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নগেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া, চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "এক পেয়ালা চা দিক?" নগেন্দ্র সম্মতি জানাইলে প্রকাশক মহাশয় হাঁকিলেন, "ওরে, নগেন বাবুকে এক পেয়ালা চা দে; আর আমার জন্যেও আর এক পেয়ালা আনিস।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সমাজদ্রোহী কিরকম বিক্রী হচ্চে?"

প্রকাশক বলিলেন, "বেশ টানছে। এই এক সপ্তাহ ত বই বেরিয়েছে? এরই মধ্যে প্রায় ২৫০ গেছে। পূজোর মধ্যে ৪।৫শো কেটে যাবে বোধ হয়।"

শুনিয়া নগেন্দ্রের মনটি পুলকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কেমন বলছে?"

প্রকাশক বলিলেন, "তা—ভালই বলছে। কিন্তু কেউ কেউ আবার বলছে, অন্য সব জায়গা ভাল হয়েছে, কিন্তু গণিকা-চরিত্র-গুলো ভাল হয়নি।"

নগেন্দ্র একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রুচি-বাগীশ মহাশয়েরা বুঝি?"

প্রকাশক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না, তারা রুচিবাগীশ দলের লোক নয়। বরং একটু—অর্থাৎ—ইয়ে দলের! তারাই ত বেশীভাগ খদ্দের কি না। তারা বলছে, 'মশাই, নগেন বাবু ঐ যে গণিকা চরিত্রগুলি এঁকেছেন, ও সাফ কল্পনা। তাদের চাল চলন কি ঐরকম, না তাদের কথাবার্ত্তা ঐরকম রবিঠাকুরী ধাঁজের? নগেন্দ্রবাবু বোধ হয় জ্যান্ত গণিকার সঙ্গে কখনও কোনও কারবার করেন নি; তাই তাদিকে এমন অদ্ভুত করে এঁকেছেন। চিত্রগুলি যদি বাস্তব হত, তা হ'লে বইখানি আরও বেশী হৃদয়-গ্রাহী হতে পারতো।' এই কথা তো তারা বলে।" বলিয়া প্রকাশক মহাশয় অবনত মুখে চা পান করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র এই সমালোচনা খণ্ডন করিতে পারিল না। বাস্তবিকই ত, গণিকাচরিত্র অঙ্কিত করিতে সে নিজ অভিজ্ঞতার কিছুমাত্র

সাহায্য পায় নাই। নাটকে উপন্যাসে গণিকাদের বর্ণনা, এবং লোক মুখে কিছু কিছু শুনা কথা মাত্রই ত তাহার অবলম্বন! এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চা পান শেষ করিল।

নগেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া প্রকাশক বলিলেন, "আপনি যদি ঐ সব দলে মাঝে মাঝে একটু আধটু মেশেন, তাতে আর ক্ষতিটা কি? বিলাতী ঔপন্যাসিকেরা, যাঁরা দরিদ্রপল্লীর গল্প লিখবেন, তাঁরা রীতিমত দরিদ্র সেজে তাদের পল্লীতে গিয়ে বাস করে', তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে', নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' এনে নভেল লেখেন শুনেছি।"

আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নগেন্দ্র উঠিল। প্রকাশক বলিলেন, "আমার কথাটা ভেবে দেখবেন তা হলে?"

"হ্যাঁ—ভেবে দেখব বৈকি।" বলিয়া নগেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

৩

সেই দিন রাত্রে আহারের পর, বাসার নির্জ্জন ছাদে বসিয়া, নগেন সুধীরকে তাহার প্রকাশকের মন্তব্য ও প্রস্তাবটা জানাইল। শুনিয়া, সুধীর প্রথমটা শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "ছি ছি, তাও কি হয়?"

নগেন্দ্র সুধীরকে বুঝাইল, উদ্দেশ্য যখন মন্দ নহে, উদ্দেশ্য যখন কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়—জ্ঞান আহরণ, তখন আর ইহাতে দোষটা কি? কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সুধীর স্বীকার করিল যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওরূপ কার্য্য দোষাবহ হইবে না বটে। জিজ্ঞাসা

করিল, "তা, আপনি তাদের সঙ্গে কি করে মিশবেন? কাউকে ত আপনি জানেন না!"

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্যে কোনও সুপারিশ বা পরিচয় পত্র আবশ্যক হয় না হে! কিঞ্চিৎ অর্থ থাকলেই হল। কিন্তু, আমি যে মৎলবটি ঠিক করেছি, তাতে বোধ হয় টাকারও কোনও আবশ্যক হবে না।"

সুধীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

নগেন্দ্র বলিল, "আমাদের ব্রজনাথ মল্লিক—আমাদের চা বাগান গুলিতে যিনি কোদাল আর কম্বল সরবরাহ করেন, তিনি বছর দুই আগে আমাকে একবার তাঁর বাগান পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে, ঐ দলের একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এমন তার স্বভাব, এমন কথাবার্ত্তা যে, সে আর তোমায় কি বলব! সে আমায় তার ঠিকানা দিয়েছিল; তার সঙ্গে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্যে বিশেষ করে' অনুরোধ করেছিল। ভাবছি, তাকেই চিঠি লিখে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তার মন যে রকম উঁচু, কখনই সে আমার কাছে টাকা চাইবে না। কিছুদিন মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করলে, তাকেও বেশ চিন্‌তে পারবো, ঐ দলের আরও কত স্ত্রীলোক ত সেখানে যাওয়া আসা করে, তাদেরও চাল চলন, কথাবার্ত্তা, জীবন যাত্রা প্রণালী 'ষ্টাডি' করবার বেশ সুযোগ পাব।"

সুধীর কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিল। শেষে বলিল, "কিন্তু দাদা, মানুষের মন; শেষে হিতে বিপরীত ঘটিয়ে বস্‌বেন না ত?"

নগেন হাসিয়া বলিল, "সে ভয় নেই। আমি তার গোড়া মেরে রেখে তবে গিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।"

সুধীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে' দাদা?"

নগেন বলিল, "সে তুমি কাল জানতে পারবে।"

নগেন্দ্র রাত্রে শয়নঘরে খিল বন্ধ করিয়া এই পত্রখানি লিখিল—

স্নেহের ভগিনী,

তোমার স্মরণ আছে কি না জানি না, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কাশীপুরের এক বাগানে এক রাত্রে তুমি মুজরা করিতে গিয়াছিলে সেইখানে তোমার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। রাত্রি একটু অধিক হইলেই, সমবেত স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুরাপানে হতজ্ঞান অবস্থায় ভূমিতে লুটাইতেছিল, কেবল তুমি এবং আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম! তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সহিত আসিয়া আলাপ করিয়াছিলে, এবং আমাকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া তুমি নিজে উদ্যোগিনী হইয়া পাকশালা হইতে খাবার আনাইয়া পরম যত্নে আমায় খাওয়াইয়াছিলে। আশা করি এখন তোমার সব কথা মনে পড়িবে।

সে রাত্রে তোমার ঠিকানাযুক্ত একখানি কাগজ তুমি আমায় দিয়াছিলে, এবং অনুরোধ করিয়াছিলে যে, আমি যেন একদিন গিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তখন তোমায় মৌখিক সম্মতি জানাইয়াছিলাম, যদিও মনে মনে স্থির জানিতাম যে,

তোমার অনুরোধ আমি কখনও পালন করিব না। কারণ, তখন ওরূপ কার্য্যকে আমি অত্যন্ত নীতি-বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতাম। তাই আমার সে মৌখিক প্রতিশ্রুতি এতদিন রক্ষা করি নাই। কিন্তু এখন নবযুগের নূতন আলোকে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখন আমি অভিলাষী হইয়াছি। তোমার ব্যবহারে ও তোমার সঙ্গে সেই অল্পক্ষণ আলাপেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, জগতের চক্ষে তুমি একজন পতিতা নারী হইলেও তোমার অন্তঃকরণ অতি কমনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। আজ স্বীকার করিতে বাধা নাই, আমি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কোনও কুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নহে ;—ফুলের সৌন্দর্য্যে, পাখীর কলগানে মনুষ্য-হৃদয় যে কারণে মুগ্ধ হয়, আমিও সেই কারণেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। (আর, এ পত্রখানিও কোনও কুভাব প্রণোদিত হইয়া আমি যে লিখিতেছি না, উপরে যে শব্দে তোমায় সম্বোধন করিয়াছি তাহা হইতেই তুমি বুঝিতে পারিবে।) দুই বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু আজিও তোমাকে আমি ভুলিতে পারি নাই। তোমার সেই ঢল ঢল সুন্দর মুখখানি আমার মানস পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। তাই তোমার হৃদয়খানি আরও কাছাকাছি পাইবার জন্য—সেখানির পরিচয় আরও নিবিড়ভাবে লাভ করিবার জন্য,—আমার মনে প্রবল বাসনা জন্মিয়াছে। আমি জানি তোমাদের জীবন বড় নিঃসঙ্গ—বড় একা—কেহ তোমাদের আপনার হয় না—বা তোমাদিগকে যথার্থ আপনার কেহ করে না

—হাটের বিকিকিনি মাত্র। আমার অভিলাষ, আমি তোমার বন্ধু হই, সখা হই, আত্মীয় হই—এই জন্যই আমি তোমার দর্শন কামনা করিতেছি; অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে। ইতি—

পুনশ্চ—খামে পত্র দিও।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়।

ঠিকানা—২৭ নং দুর্গাচরণ ঘোষের লেন,

বউবাজার, কলিকাতা।

পরদিন প্রাতে এই পত্রখানি পড়িয়া সুধীর একেবারে মোহিত হইয়া গেল। বলিল, "দাদা, সামান্য একখানা চিঠি লিখেছেন, তাতেও জিনিয়সের ছাপ! এই ঠিক হয়েছে। সকল কথা গোড়া থেকে স্পষ্ট করে বলা রইল, ভালই হ'ল।"

দুইদিন ধরিয়া নগেন্দ্রনাথ পত্রোত্তরের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কালযাপন করিল। তৃতীয় দিনে পত্রোত্তর আসিল।

পত্রখানি সুলিখিত নহে, সুরচিত নহে, বানান ভুল অত্যন্ত বেশী। সংশোধনান্তে নিম্নে উহার প্রতিলিপি আমরা প্রকাশ করিলাম:—

মহাত্মন্,

আপনার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত

সুখিনী হইলাম তাহা এই সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। আপনি অধিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই আমার স্মরণ আছে। সেই বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আপনার নাম আমি জপমালা করিয়াছি জানিবেন। আপনি দয়া করিয়া আগামী মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যার পরে আসিবেন, আমি তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার আশাপথ চাহিয়া থাকিব।

আপনার চিরাধিনী
শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী।

এই পত্র যথাসময়ে নগেন্দ্রনাথ, সুধীরকে দেখাইল। সুধীর পত্র পড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল। বলিল, "আপনার কাছে তার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে কেমন ধারণা হয়েছিল যে, স্ত্রীলোকটি বেশ শিক্ষিতা। রাম রাম, এত দেখছি নিতান্ত মূর্খ!"

সুধীরের এ উক্তি শুনিয়া নগেন্দ্র মনে মনে যেন একটু বিরক্ত হইল। বলিল, "বেথুন কলেজে পড়বার সুযোগ ত কখনও পায় নি, কাযেই এ রকম চিঠি সে লিখেছে। কিন্তু বেশী লেখাপড়া না জানলেই যে মানুষ একেবারে অপদার্থ হয়ে গেল তা মনে করা ভুল সুধীর।"

সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা মনে করিনি দাদা। তবে শুধু এই বলছিলাম যে, ভাষাটা—"

নগেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "চিঠির ভাষার কথা ছেড়ে দাও।

তার মুখের ভাষা শুন্‌লে তাকে আর মূর্খ বলে মনে হবে না। এমন কি, তাকে—সে যা, তাই বলেই মনে হবে না।"

নগেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সে ত নিজে যাইবেই, সুধীরকেও লইয়া গিয়া, উহার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিবে।

ঠিক এক সপ্তাহ কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির পর, আজ মঙ্গলবার প্রাতে, তবলা বাঁয়া বেহালা হার্ম্মোনিয়ম বিছানা বাক্স ভৃত্য ওস্তাদজি ও কুকুর সহ, নর্ত্তকী প্রভাবতী মফঃস্বল হইতে মুজরা করিয়া তাহার বাসায় ফিরিল। এ বাড়ীখানি তাহার নিজের নহে, এগ্রিমেণ্ট করিয়া লওয়া; ত্রিতলের সমস্ত কক্ষগুলি সে নিজে অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতলের কক্ষগুলিতে দুইজন ভাড়াটিয়া আছে—ইহারাও নর্ত্তকী, তবে তাহাদের তেমন পশার নাই। যে আসরে প্রভার ৫০৲ টাকায় বায়না হয়, সে আসরে ইহারা ১০৲ টাকার বেশী পায় না। এই কারণে ইহারা মনে মনে প্রভার বিলক্ষণ ঈর্ষা করে; কিন্তু প্রভা বাড়ীওয়ালী, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে সাহস করে না। একতালায় পাকাদি হয়, ভৃত্যেরা থাকে।

প্রভাবতী দ্বিতলে উঠিয়া, সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, বাড়ীর খবর সব ভাল ত?"

কুসুম বলিল, বাড়ীর খবর ত এক রকম ভালই। কিন্তু পাড়ায় আজকাল বড় ভয় হয়েছে দিদি!"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

কুসুম বলিল, "বড় গুণ্ডার উপদ্রব হয়েছে। পর্শু রাত্রে একটা গুণ্ডা, বাবু সেজে যামিনীর ঘরে এসেছিল। ছুরি দেখিয়ে, তার গহনাগুলি সব কেড়ে নিয়ে, পালিয়ে গেছে।"

"সে চেঁচামেচি করেনি?"

"তার মুখ বেঁধে ফেলেছিল, চেঁচাবে কোত্থেকে? ভাগ্যিস একটু পরে একজন ভাড়াটে সে ঘরে গিয়ে পড়েছিল, সে তার মুখ থেকে কাপড়ের বাঁধন খুলে দিলে, নইলে দম বন্ধ হয়েই মরে যেত।"

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ হয়েছে বৈকি। তা, সে চোরকে পুলিশ আর কোথায় খুঁজে পাবে?"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিঠিপত্র কিছু এসেছিল?"

কুসুম বলিল, "হ্যাঁ এসেছিল একখানা। তোমার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছি।"

এমন সময় অপর ভাড়াটিয়া সারদাসুন্দরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি উঠিয়া বলিল, "এই যে প্রভা দিদি, এই আসছ বুঝি? দাঁড়াও আগে হাঁপ ছাড়ি। ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসেছি।"

প্রভা ও কুসুম যুগপৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে সারদা?"

"ওগো ঐ গলিতে পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে। গলি দিয়ে যে যাচ্চে তাকে ধরছে। তাই দেখে আমি ভয়ে ছুটতে ছুটতে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এত পুলিস কেন?"

"খুন হয়েছে যে গো!"

"কে খুন হল?"

"কামিনী।"

"অ্যাঁঃ—কামিনী খুন হয়েছে? কি করে খুন হল? কে খুন করলে?"

"শুনলাম, কাল রাত্রে একজন গুণ্ডা, বাবু সেজে কামিনীর ঘরে এসেছিল। তারপর অনেক রাত্রে, কামিনীকে খুন করে,' তার গয়নাগাঁটি সব নিয়ে সরে পড়েছে। গায়ের গয়না ত নিয়েছেই, আঁচল থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবি নিয়ে লোহার সিন্ধুক খুলে, বাকী গয়না, টাকা কড়ি যা ছিল সমস্ত নিয়ে গেছে।"

শুনিয়া প্রভাবতী ও কুসুম উভয়েই হায় হায় করিতে লাগিল। আর দুই চারি কথার পর, প্রভা ত্রিতলে উঠিয়া নিজ শয়ন ঘরের চাবি খুলিল। খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইল, কুসুম কথিত ডাকের চিঠিখানা মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

চিঠিখানা কুড়াইয়া প্রভা শিরোনামা দেখিল, হস্তাক্ষর অপরিচিত। চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া, ভৃত্যকে চায়ের জল চড়াইতে আদেশ দিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিল।

বাজার আনিবার জন্য ঠাকুরকে টাকা দিয়া, চা পান করিতে করিতে চিঠিখানা খুলিল।

চিঠি পড়িয়া, প্রভার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "কুসুম ও কুসুম, ও সারদা, তোরা শীগ্‌গির আয়।"

কুসুম ও সারদা, উভয়েই একত্র বসিয়াছিল। এই ডাক শুনিয়া তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। পরে বাহির হইয়া বলিল, "কেন বাড়ীউলি দিদি? ডাকছ?"

উপর হইতে পূর্ব্ববৎ আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর আসিল—"শীগগির আয়—সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

কুসুম ও সারদা তখন মুখের হাস্যরেখা গোপন করিয়া, মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন লইয়া ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মেঝের উপর চা ঢেউ খেলিতেছে, প্রভার কুকুর তাই চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে; পেয়ালা ও পিরিচ টেবিলের উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রভা চক্ষু কপালে তুলিয়া, তাহার ফরাস বিছানায় বসিয়া হাঁপাইতেছে।

কুসুম ও সারদা প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদি, কি হয়েছে?"

প্রভা চিঠিখানা তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

কুসুম তখন চিঠি লইয়া পড়িল।

মেছুয়াবাজার।

শ্রীচরণকমলেষু—

প্রাণপ্রিয়সি, একদিন কোনও স্থানে তোমার মুজরো শুনিয়া আমি প্রাণে এতই আনন্দ পাইয়াছিলাম, যদিও আমি একজন সামান্য গুণ্ডা, সেই অবধি মনে মনে তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি ও ভক্তি করি। তাই এ পত্র তোমায় লিখিতেছি। আমাদের দলের অপরাপর গুণ্ডা লোকেরা জানিতে পারিয়াছে যে, মফস্বল হইতে মুজরা করিয়া অনেক টাকা লইয়া মঙ্গলবার দিবস তুমি কলিকাতায় ফিরিবে ; তাহারা পরামর্শ করিয়াছে রাত্রে তাহারা তোমার নিকট বাবু সাজিয়া যাইবে এবং তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার অলঙ্কার ও টাকা কড়ি সমস্ত অপহরণ করিবে। তোমার গলায় ছুরী দিবে ইহা আমার সহ্য না হওয়াতে, এই পত্র লিখিয়া তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম। এ পত্র পড়িয়া তুমি পুড়াইয়া ফেলিবে, কারণ ইহা আমাদের দলের লোকের হস্তগত হইলে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহারা আমাকেই হত্যা করিবে সন্দেহ নাই। ইতি—

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী অধম ভৃত্য

শ্রীগুণ্ডা।

চিঠি পড়িয়া কপটী কুসুম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "তাই ত বাড়ীউলি দিদি, কি হবে ?"

সারদা পেচকের মত গম্ভীর স্বরে বলিল, "এখন উপায় ?"

প্রভাবতী শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুদিত চক্ষু হইতে অশ্রু

গড়াইতে লাগিল। কুকুরটি চা পান শেষ করিয়া তাহার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সারদা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ ভাই কুসুম, যদি আমাদিগেও খুন করে? এইবেলা কোথাও পালাই চ'।"

কুসুম বলিল, "পালিয়ে যাব কোথা? কোনও চুলো কি আছে? আর, আমাদের আছেই বা কি ভাই, যে নেবে? খানকতক পিতলের গহনা, এনামেলোর ডিশ, আর ফেঁসোর গদি! তবে, প্রভা দিদির বোধ হয় পালানোই উচিত। সাতদিনের বায়না নিয়ে মফঃস্বলে গেছে, অনেক টাকা কড়ি নিয়ে আজ তার ফিরে আস্‌বার কথা, তা কেমন করে তারা টের পেয়েছে ভগবান জানেন। দিদি, ও দিদি, ও রকম করে পড়ে' থাকলে কি হবে ভাই? ওঠ, একটা পরামর্শ যুক্তি করা যাক।"—বলিয়া সে সারদার পানে চাহিয়া, অলক্ষ্যিতে একটু হাসিল।

প্রভা উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমার চাকরকে ডাক ত।"

ভৃত্য নিম্নতলে বসিয়া মশলা বাঁটিতেছিল, কুসুমের ডাক শুনিয়া, হাত ধুইয়া উপরে আসিল।

প্রভা বলিল, "একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জল্‌দি।"

সারদা ও কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথা যাবে দিদি?"

প্রভা বলিল, "লালবাজার। পুলিস কমিশনর সাহেবকে গিয়ে চিঠিখানা দেখাই। তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেন কিনা দেখি।"

ট্যাক্সি আসিবার শব্দ শুনিয়া, প্রভা উঠিয়া তাহার কেশবেশে একটু পারিপাট্য সাধন করিয়া লইল। তাহার পর জুতা মোজা

পরিয়া, কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সারদা ও কুসুম দ্বিতলে নামিয়া গেল। সারদা বলিল, "পুলিসে গেল, আমার কিন্তু ভয় করছে ভাই।"

কুসুম বলিল, "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।"

সারদা বলিল, "তখনই ত তোকে আমি বারণ করেছিলাম, তুই কি শুনলি? বল্লি, 'এ দেখছি হুবহু তরুবালার অখিল, কোনও কুঅভিপ্রায় নেই, পবিত্র প্রেম করতে আসছেন। দাঁড়াও একটু মজা করা যাক!"—

"মজা ত করলি, কিন্তু শেষে আমরাই জাল করার দায়ে পড়ে যাব না কি?"

কুসুম বলিল, "ঈস্! আমাদের কে ধরে? কিছু প্রমাণ আছে? হাতের লেখা ত আর আমাদের কারু নয়।"

সারদা বলিল, "সেই ভরসায় কি নিশ্চিন্দি থাকা যায় ভাই?"

"তুই তবে বসে বসে 'চিন্দি' কর্। আমি যাই, নেয়ে নিই গে, আবার কলের জল চলে' যাবে।"—বলিয়া কুসুম তাহার ঘটি সাবান ও গামছা লইয়া প্রস্থান করিল।

৭

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগেন্দ্র আপিস হইতে ফিরিয়া আসিল। আপিসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "ওঃ আজ কি গরমটাই গেল! আপিসে ঘেমে একবারে নেয়ে উঠেছিলাম। স্নান করে ফেলি।"

সুধীর বলিল, "দাদা, এই অবেলায় স্নান করবেন? তার চেয়ে না হয় ভিজে গামছা দিয়ে—"

নগেন্দ্র বলিল, "না না—কিছু হবে না!"—বলিয়া সে নিজ সাবানদানী ও তোয়ালে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া, সাবধানে কেশ বিন্যাস করিয়া, নগেন্দ্র খাবার খাইয়া চা পান করিল। সুধীরকে বলিল, "ওহে তৈরি হয়ে নাও।"

সুধীর বলিল, "আমি—আমার আর যাবার দরকার আছে কি? হয় ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে নিজের জীবন কাহিনী—"

নগেন্দ্র বলিল, "জীবন কাহিনী কি আজই তাকে জিজ্ঞাসা করবো? আজ একটু আলাপ পরিচয় করে আসা মাত্র। চল চল। অন্ততঃ আজকের দিনটে ত চল। অন্যদিন না হয় আমি একাই যাব।"

সুধীর অগত্যা কাপড় বদলাইতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নগেন্দ্রের ঘরখানি সৌগন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। নগেন্দ্র, জামাই বাবুটি সাজিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে। প্রভাবতীকে উপহার দিবার জন্য হাতে একখানি "সমাজদ্রোহী" পুস্তক। উভয়ে তখন বাসা হইতে বাহির হইল। বড় রাস্তায় পৌঁছিয়া নগেন বলিল, "ওহে একখানা ট্যাক্সি ধরা যাক।"

সুধীর বলিল, "কত দূরই বা? মিছামিছি আর ট্যাক্সি কেন দাদা?"

নগেন্দ্র বলিল, "ওহে, গরমটি কি রকম দেখ্‌ছ? হেঁটে গেলে, ঘামে ভিজে, ভিজে বিড়ালটি হয়ে সেখানে পৌছব। ঘেমো গন্ধে কি সে বেচারীর মাথাটি ধরিয়ে দেবো?"

রাস্তা হইতে একটি ট্যাক্সি ধরা হইল। দশমিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি ঠিকানায় পৌছিল।

নগেন্দ্র ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, দরজার উপর বাড়ীর নম্বরটি দেখিল। ঠিক হইয়াছে জানিয়া, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় একজন ভৃত্যকে বাহির হইতে দেখিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এজি দেখো, প্রভাবতী বিবি হিঁয়া রহতা হায়?"

ভৃত্য বলিল, "হাঁ বাবু, তেতালায় আছেন।"

দুইবন্ধু তখন অঙ্গনে প্রবেশ করিল। নির্জ্জন অঙ্গন পার হইয়া সিঁড়ি উঠিয়া, দ্বিতলে এবং ক্রমে ত্রিতলে উঠিল। দেখিল, একটি কক্ষে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলিতেছে, পাখা চলিতেছে, ফরসা বিছানায় একজন স্ত্রীলোক একটি কুকুর কোলে করিয়া বিমর্ষ বদনে বসিয়া আছে। দুইবৎসর পরে দেখিলেও, নগেন তাহাকে চিনিতে পারিল।

অগ্রে অগ্রে নগেন্দ্র, পশ্চাতে সুধীর। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া নগেন বলিল, "প্রভাবতী—ভাল আছ ত?"

প্রভাবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনারা কে? চিনতে পারছিনে ত?"

নগেন্দ্র বলিল—"চিনতে পারছনা?"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধীর তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া।

প্রভাবতী রুক্ষস্বরে বলিল, “কি রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরে ঢুকে পড়লেন যে?”—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—“পুলিস, পুলিস।”

পর মুহূর্ত্তে, পাশের ঘরখানির বদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। চারিজন কনেষ্টবল তন্মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া “শালা গুণ্ডা”—বলিয়া, এক এক জনের উভয় হস্ত, দু’দুজনে ধরিয়া ফেলিল।

প্রভা বলিল, “এই লোক গুণ্ডা হায়। হামকো খুন করনে আয়া হায়।”

নগেন্দ্র বলিল, “প্রভা, এ কি কাণ্ড? আমি নগেন্দ্র—নগেন্দ্র—এদের বল—”

প্রভা বলিল, “নগেন্দ্র তোমার কুন্দনন্দিনীর কাছে যাও। এখানে কেন মরতে এসেছ? পাহারাওয়ালা, এই দুনো আদমি গুণ্ডা হায়, হামকো খুন করনে আয়া হায়। পাকড়কে লে যাও।”

“চল্ বে চল”—বলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কনেষ্টবলদ্বয়, ঔপন্যাসিক ও তাঁহার ভক্তকে থানায় লইয়া চলিল।

সেখানে হাজত ঘরে সারারাত্রি বন্ধ থাকিয়া, পরদিন প্রাতে থানার ইনস্পেক্টর বাবুর সম্মুখে তাহারা নীত হইল! নগেন্দ্র কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, আত্মপরিচয় সহ আমূল বৃত্তান্ত ইন্স্পেক্টর বাবুকে নিবেদন করিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রভাবতীর স্বাক্ষরিত পত্রখানি নগেন্দ্রের পকেটেই ছিল, সেখানি বাহির করিয়া ইন্স্পেক্টর বাবুকে সে দেখাইল। প্রভাকে উপহার দিবার জন্য যে বইখানি লইয়া গিয়াছিল, তাহাও দেখাইল।

ইন্‌স্পেক্টর বাবুটি শিক্ষিত লোক, এবং ভদ্রলোক। নগেন্দ্রের কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। একটু হাসিয়া উভয় আসামীকে তিনি মুক্তি প্রদান করিলেন।

যাইবার সময় নগেন্দ্র ইন্‌স্পেক্টর বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই মশাই, ব্যাপারটা যেন খবরের কাগজে না ওঠে। তা'হলে আমার মান ইজ্জৎ ত যাবেই, বই বিক্রিও বন্ধ হয়ে যাবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা খবরের কাগজে যাতে ব্যাপারটা না ওঠে, আমি তার ব্যবস্থা করব এখন। কিন্তু, সাবধান, আপনি আর ওসব পাড়ায় হাঁটবেন না।"

নগেন্দ্র বাসায় ফিরিয়া আসিল। রাত্রে অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ স্বরূপ বাসার লোককে বলিল, খিদিরপুরে নিমন্ত্রণ ছিল, আহার শেষ হইতে অধিক রাত্রি হইয়া গেল, ট্রাম পাওয়া গেল না, তাই উভয়ে সেইখানেই শয়ন করিয়া ছিল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া নগেন্দ্র আপিসে চলিয়া গেল। পরদিন নিজ গ্রন্থাবলী একসেট ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে "ভক্তি উপহার" স্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনীর আত্মকথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য-কাহিনী।

আমার নাম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। হাল সাকিম কলিকাতা। মৃত্যু নিকট জানিয়া, আমি নিজ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা যদি কোনও দিন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তবে আমার মত অবস্থাপন্না বঙ্গরমণীগণ সাবধান হইতে পারিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক আশা ও অভিপ্রায়। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল কোনও কুলই আমি উজ্জ্বল করি নাই—সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত নামধামগুলির পরিবর্ত্তে আমি কাল্পনিক নামধামই ব্যবহার করিয়াছি। তবে আমার আসল নাম বিনোদিনীই বটে।

আমি, বলিতে গেলে, জন্মদুর্ভাগিনী। আমার শৈশবেই, প্রথমে মাতা এবং বৎসর না ঘুরিতেই আমার পিতা পরলোকগমন করেন। আমার অন্য কোনও নিকট আত্মীয়স্বজন ছিল না, কেবল এক জ্যেঠা মহাশয় ছিলেন, তিনি পুরুলিয়াতে চাকরী করিতেন। তিনিই আসিয়া গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে আমার পিতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করেন। জিনিষপত্র কতক বেচিয়া, কতক বিতরণ করিয়া, পৈতৃক বাটীতে তালা লাগাইয়া, আমাকে

সঙ্গে লইয়া পুরুলিয়াতে চলিয়া যান। তখন আমার বয়স চারি বৎসর মাত্র।

জ্যেঠা মহাশয়ের একটি পুত্র ছাড়া তিনটি কন্যা ছিল। পরে শুনিলাম, আমাকে পৌঁছিতে দেখিয়া জ্যেঠাই-মা নাকি বলিয়াছিলেন, "বেশ হ'ল, এবার গণ্ডা ভর্ত্তি হ'ল।"

আমার জ্যেঠতুতো বোন তিনটির নাম—নীহারবালা, শৈলবালা এবং ননীবালা। শৈল ছিল আমার সমবয়সী—কিন্তু তথাপি তাহার সহিত আমার তেমন ভাব হয় নাই। আমি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলাম বলিয়া শৈলবালা আমার হিংসা করিত; জ্যেঠাই-মা আমাকে লুকাইয়া মাঝে মাঝে তাহাকে এটা ওটা খাওয়াইতেন বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম। আর একটু বয়স হইলে যখন আমরা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম, তখন সে আমার চেয়ে ভাল পড়া বলিতে পারিত, ভাল প্রাইজ পাইত বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম; এবং তার চেয়ে আমার রং ফরসা বলিয়া সে আমার হিংসা করিত

নীহারদিদি আমাদের চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিল। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইল। জ্যেঠা মহাশয়ের পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহার বেশীর ভাগই এই বিবাহে নিঃশেষিত হইয়া গেল। জ্যেঠাই-মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একটির বিয়েতেই যা কিছু ছিল, সব খরচ ক'রে ফেল্লে, বাকীগুলির বেলায় কি উপায় করবে, তা কিছু ভেবেছ?" জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছিলেন,

"উপায় করবার মালিক আমিও নই, তুমিও নও। যে উপায় করনেওয়ালা, সেই উপায় করবে, তুমি দেখে নিও।"

নীহারদিদির ত কিনারা হইয়া গেল, এবার আমার এবং শৈলর পালা। একযোড়া ভাল পাত্রের সন্ধান করিবার জন্য জ্যেঠা মহাশয় নানা স্থানে চিঠি লিখিলেন; দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ অন্বেষণ চলিল, কিন্তু একযোড়া ত দূরের কথা, মনের মত অথচ দামে সস্তা একটি পাত্রও মিলিল না। আমাদের দুই বোনকে তেরো বছরের ধিঙ্গি দেখিয়া, জ্যেঠাই-মা সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন এবং এক এক দিন জ্যেঠা মহাশয়ের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শচীন আসিল।

এই সময় নীহার দিদির শ্বশুর, জ্যেঠা মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ (জামাই বাবুর ছোট ভাই) গত ভাদ্র মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে; কলেজে তাহার পার্সেণ্টেজ গিয়াছে, সে এবার পরীক্ষা দিতে পাইবে না; ডাক্তার বায়ুপরিবর্ত্তন করাইতে উপদেশ দেন; এতএব বৈবাহিক মহাশয়ের যদি অসুবিধা না হয়, তবে শীতের

কয়টা মাস শচীন পুরুলিয়াতে থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে।

জ্যেঠাই-মার সহিত পরামর্শ করিয়া, জ্যেঠা মহাশয় শচীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। পরে জানিয়াছিলাম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করিবার জন্য তাঁহারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই; এই উপকারটুকুর বদলে, শচীনের পিতাকে চক্ষুলজ্জার ফেরে ফেলিয়া সস্তায় শচীনকে জামাই করিয়া লইতে চেষ্টা করাই তাঁহাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল। নীহার দিদি অনেক দিন পিত্রালয়ে আসেন নাই; তাঁহাকেও শচীনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। যথাদিনে দেবর সহ নীহার দিদি আসিয়া পৌঁছিলেন।

শচীনের বয়স তখন ১৮।১৯ বৎসর, রংটি বেশ পরিষ্কার, মুখ-চোখও সুগঠিত—এক কথায়, বেশ সুশ্রী যুবা পুরুষ। তবে রোগে ভুগিয়া তাহার দেহকান্তি অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মাসখানেক পুরুলিয়ায় থাকিয়াই, শচীন তাহার স্বাস্থ্য, বল, কান্তি আবার ফিরিয়া পাইল। জ্যেঠাইমার সঙ্গে মাঝে মাঝে নীহার দিদির পরামর্শ হইতে লাগিল, শচীনের সহিত শৈলবালার বিবাহটি হইলেই বেশ হয়। শৈল আমার চেয়ে তিন মাসের বড় ছিল, সুতরাং প্রথম দাবী তাহারই সন্দেহ নাই; আমার কিন্তু সে কথাটা শুনিতে ভাল লাগিত না। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিতে করিতে আমি মনে মনে বলিতাম—"হে ঠাকুর, শৈলর সঙ্গে যেন শচীনের বিবাহ না হয়।"

প্রার্থনা আশ্চর্য্যভাবে অতি সত্বর সফল হইয়া গেল। এক

ভদ্রলোক সপরিবারে পুরুলিয়াতে বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন; শৈলকে দেখিয়া এবং তাহার কোষ্ঠী নিজ পুত্রের কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া শৈলকে তাঁহার এমনই পছন্দ হইয়া গেল যে, একরূপ বিনা পণেই অগ্রহায়ণ মাসেই শৈলকে তিনি নিজ পুত্রবধূ করিয়া লইলেন।

তখন "আমিই শুধু রইনু বাকী।" (ননীবালা ৮ বৎসরের বালিকামাত্র, তাহার কথা ধর্ত্তব্য নহে)। শৈল পুরুলিয়াতে শ্বশুর-বাড়ীর বাসায় থাকিতে লাগিল; মাঝে মাঝে অল্পসময়ের জন্য এ বাড়ীতে আসিত। তাহার স্বামী, কলেজ কামাই হইবে বলিয়া বিবাহের এক সপ্তাহ পরেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল।

এখন জ্যেঠাই-মা ও নীহার দিদিতে পরামর্শ হইত, "বিনির সঙ্গে শচীনের বিয়েটি হ'লে বেশ হয়।" যে দিন কথাটি আমি শুনিলাম, সে দিন কাণে যেন আমার মধুবর্ষণ হইল।

পরামর্শ, ক্রমে মেয়ে-মহল ছাড়াইয়া. পুরুষ-মহলে পৌঁছিল। পৌষ মাসে, জ্যেঠা মহাশয় শচীনের পিতাকে পত্র লিখিয়া, আমার সহিত শচীনের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন।

এই পত্র রওয়ানা হইবার পর হইতে, শৈল আসিয়া শচীনকে আমার বর উল্লেখ করিয়া আমায় "ক্ষেপাইতে" সুরু করিল; দিদির মুখে ঐরূপ শুনিয়া আট বছরের ননীবালা ছুঁড়ীটাও, এ বলিয়া ক্ষেপাইত। শৈল তবু শচীনের অসাক্ষাতে বলিত; নির্ব্বোধ ননীবালা একদিন তাহার সামনেই বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া, শচীন আমার দিকে চাহিয়া, ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া,

সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম-ছি ছি!

পত্রোত্তর আসিল। শুনিলাম, দিদির শ্বশুর লিখিয়াছেন, মেয়েটির রূপগুণের কথা বধূমাতার 'প্রমুখাৎ' পূর্ব্বাবধিই তিনি 'শ্রুত' আছেন; পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহার অমত নাই, তবে "ন্যূনসংখ্যা" কত টাকা জ্যেঠা মহাশয় দিতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কয়েক দিন কর্ত্তা গিন্নীতে পরামর্শ চলিল। অবশেষে জ্যেঠা মহাশয় উত্তর দিলেন, (চিঠিখানি রওনা হইবার পূর্ব্বে লুকাইয়া আমি দেখিয়াছিলাম)—"বড় মেয়েটিকে যখন আপনার পুত্রবধূ করিয়াছিলাম, তখনই আমার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তার পর সম্প্রতি আর একটি মেয়ে পার করিয়াছি। তবে, এ বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপা ও উদারতাগুণে, এবার অল্পেই রেহাই পাইয়াছি—তাই ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিব—নচেৎ তাহাও আমার উপস্থিত ক্ষমতায় কুলাইত না। জানিবেন এই টাকাও সমস্ত আমার ঘরে নাই, কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে। আশা করি, নিজগুণে"—ইত্যাদি।

আমার ঘাড়ে যে কি ভূত চাপিল, শচীন শচীন করিয়া আমি পাগল হইয়া উঠিলাম। সুবিধা পাইলেই আড়াল হইতে আমি তাহার পানে চাহিয়া থাকিতাম। আমার এই "চুরি ক'রে চাওয়া" দুই এক দিন শৈল আসিয়া ধরিয়া ফেলিয়া আমায় ঠাট্টাও করিয়াছিল।

আজকালকার নভেলে দেখিতে পাই. হিন্দুঘরের "ধেড়েকেষ্ট" মেয়েরা প্রায়ই অমুক "দার" সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া কোর্টশিপ চালাইতেছে; সেই "দাদা"র সহিত কাহারও বা বিবাহ হইতেছে, কাহারও বা ফস্কাইয়া যাইতেছে। আমাদের বাড়ীতে কিন্তু সেরূপ হইতে পাইত না। শৈল, আমি, দুই জনেই 'সোমত্ত' মেয়ে, শচীনের সামনে বাহির হইতাম, তাহার সহিত আবশ্যকমত দুই একটি কথা কহিতাম বটে, কিন্তু ঐপর্য্যন্ত। জ্যেঠাইমার সর্ব্বদা সজাগ সাবধানতা ও কড়া শাসনে, শচীনের সহিত আমাদের কিছুমাত্র মেলামেশার অবসর ছিল না। তথাপি শচীন এমনই দুষ্ট যে, সুযোগ পাইলেই, অন্যের অলক্ষিতে আমার পানে চাহিয়া হাসিত। এক দিন বৈকালে, ঘটনাক্রমে তাহার সহিত আমার নির্জ্জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দিন শচীন শুধু হাসিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই—আমার গাল টিপিয়া দিয়াছিল। আমি রাগিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম, "ও কি?" শচীন হাসিয়া বলিয়াছিল, "দোষ কি? আমি যে তোর বর।" আমি মনের আহ্লাদ মনেই গোপন করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধভরে সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিলাম।

শচীনকেই আমার স্বামী কল্পনা করিয়া, অবোধ বালিকা আমি কত সুখের স্বপ্নই যে দেখিতাম, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। এমন সময় আমার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। শচীনের পিতা উত্তর দিলেন, তিন হাজার টাকার কম কিছুতেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে পারিবেন না।

শচীনকেও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে তিনি কড়া হুকুম জারি করিলেন।

পরদিন শচীন তাহার জিনিষপত্র বাঁধিয়া, আমাদের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যাত্রার পূর্ব্বে, একটিবার তাহার সহিত আমার দৃষ্টি-বিনিময়ের সুযোগ হয় নাই। সে চলিয়া যাওয়ার পর, আমি দ্বিতলের একটি জানালা দিয়া তাহাকে একবার দেখিতে চেষ্টা করিলাম। দেখাও হইল। তাহার উৎসুক চক্ষু সেই জানালার মাঝেই আমাকে খুঁজিতেছিল বোধ হয়। তাহার সেই ছলছল চোখ দুটি আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সে দৃষ্টি-পথের অতীত হইলে, আমি বিছানায় পড়িয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন নীচে সবাই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত—কেহ আসিয়া এ অবস্থায় যে আমায় দেখিতে পাইবে, এ সম্ভাবনামাত্র আমার মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার পৃষ্ঠদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, শৈল। শৈল আমার অশ্রুমাখা মুখ দেখিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, "বাঃ, বেড়ে! এতদূর!

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে!"

—বলিয়া গা দুলাইয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহির হইয়া গেল। কথাটা শৈল বাড়ীতে প্রচারও করিয়া দিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমার বিবাহ।

মাসখানেক পরে শুনিলাম, পাত্র ঠিক হইয়াছে, সোণাপুরে তাঁহার বাড়ী, নিঃসন্তান, দ্বিতীয় পক্ষ, বয়স ৪০ বৎসর, গ্রামে ঘি ও ময়দার দোকান আছে, অবস্থা স্বচ্ছল। এক দিন পাত্র আমাকে দেখিতে আসিলেন, দেখিয়া পছন্দও করিলেন। অল্প টাকায় হইবে বলিয়া, জ্যেঠামহাশয় এই পাত্রই স্থির করিয়াছিলেন। ৫ই বৈশাখ আমার শুভ (?) বিবাহ হইয়া গেল; আমি শ্বশুরবাড়ী গেলাম। আমি তখন চৌদ্দ বছরে পড়িয়াছি।

সেখানে গিয়া দেখিলাম, আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী নাই। বিধবা পিসশ্বাশুড়ী আছেন, তিনিই ঘরের গৃহিণী।

স্বামিভক্তি, স্বামিপূজা, স্বামিসেবাই নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, এই শিক্ষাই আবাল্য পাইয়া আসিতেছিলাম। এক দিন মনে মনেও যে আমি অন্য পুরুষকে কামনা করিয়াছিলাম, সে জন্য লজ্জায় ধিক্কারে মরিয়া যাইতাম। শচীন এক দিন আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, আমার গাল টিপিয়া দিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনের ক্ষোভে আমার ইচ্ছা করিত, এক খণ্ড লোহা পোড়াইয়া বেশ লাল করিয়া, তাহা গালের উপর টিপিয়া ধরিয়া, ঐ স্থানটা অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লই।

স্বামী আমাকে যথেষ্ট স্নেহযত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমার

পোড়া মন এমনই অপদার্থ যে, শচীনকে আমি ভুলিতে পারিলাম না। শচীনের চিন্তাও যে আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা বেশ জানিতাম; কিন্তু মনকে বশে আনিতে পারিতাম না। এই সময় "চন্দ্রশেখর" পুস্তকখানি আমার হাতে পড়িল। জ্যেঠামহাশয়ের গৃহে থাকিতে আমরা সকল বোনই লেখাপড়া ভাল রকমই শিখিয়াছিলাম; কিন্তু জ্যেঠামহাশয় মেয়েদের উপন্যাস পড়ার বিরোধী ছিলেন বলিয়া, উপন্যাস বেশী পড়িবার সুযোগ আমরা পাই নাই। তাই এতখানি বয়স পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আমার অপঠিত ছিল।

বহিখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার অবস্থার সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া যায়। কপালদোষে বিবাহের পূর্ব্বেই কোনও মেয়ের যদি অন্য পুরুষের প্রতি মন গিয়া থাকে, তবে বিবাহের পর তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহা চন্দ্রশেখর পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম। অধিকাংশ হিন্দু মেয়েই পতিভক্তি বিনা-সাধনায় লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমার মত দুর্ভাগিনী যাহারা, তাহাদের ঐ বস্তুটি লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনায় রত হইতে হইবে,—হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ইহাই চন্দ্রশেখরের উপদেশ বলিয়া বুঝিলাম এবং তদনুসারেই নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিব স্থির করিলাম।

আমি সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকি দেখিয়া, স্বামী একদিন বলিলেন, "সমবয়সী সঙ্গী সাথী একটিও নেই, একলা তোমার বড় কষ্ট হয়, না?" —শচীনের কথা তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই, পরে জানিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, "না, কষ্ট আর কি ?"

তিনি বলিলেন, "কষ্ট হয় বৈ কি। তোমার যদি দুই একটি যা কি ননদ থাকত, তাদের সঙ্গে হাসিতে গল্পেতে দিন কাটাতে পারতে। কিন্তু সে সব কিছুই ত নেই। আচ্ছা একটা কায না হয় কর না।"

"কি ?"

"বই পড়তে তুমি খুল ভালবাস। একখানি বই পেলে, তুমি খুব আগ্রহের সঙ্গে সেখানি পড় দেখতে পাই। আমাদের গ্রামে একটি ভাল লাইব্রেরী আছে। অনেক বাঙ্গালা বই আছে, কত সব মাসিকপত্র আসে,—নূতন নূতন বইও প্রায় তারা কিনে আনায়। আমি সেই লাইব্রেরীর মেম্বর হব,—যত তুমি পড়তে পার, তত বই তোমায় এনে দেবো। তা হ'লে তোমার সময় কাটাবার বেশ একটা উপায় হবে ; কি বল ?"

আমি উৎসাহের সহিত এ বিষয়ে সম্মতি জানাইলাম।

স্বামী মেম্বর হইলেন, এবং লাইবেব্রী হইতে কৃত্রিম সিল্কের চকচকে মলাটযুক্ত নূতন নূতন উপন্যাস-গ্রন্থ আনাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম নিজে তিনি দুই একখানা বহি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভালো লাগে নাই বলিয়া, সে চেষ্টা আর করিতেন না। তিনি ছিলেন "দাতাকর্ণ" যুগের মানুষ। আমি কিন্তু সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

এইরূপ কিছুদিন চলিতে চলিতে আমার মনে ধীরে একটা পরিবর্ত্তন আসিতে লাগিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, এত

কাল মা-দিদিমা'র কাছে পতিভক্তি সম্বন্ধে যে শিক্ষা আমি পাইয়া আসিয়াছি, তাহা নিতান্তই ভুল শিক্ষা। পতির প্রতি যদি যথার্থ ভালবাসা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে একটু আধটু ভক্তি বা সেবা করিলেও ততটা দোষ নাই। কিন্তু যে পতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসি না, তাঁহাকে ভক্তি করা নিজেকে অপমান করা মাত্র। দেখিলাম, আজকালকার বড় বড় লেখকগণের মতে, বঙ্কিমবাবু নিতান্তই সেকেলে লেখক। প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে লাভ করিতে পারিলেই নারীর "নারীত্ব" সফল হয়, তাহার জীবন-যৌবন ধন্য হয়, সকল যুবতীরই এই বিষয়ে যত্নবতী থাকা উচিত। নব-যুগের নবীন-আলোক-আমদানীকারক এই ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে কাহারও হস্তে যদি 'চন্দ্রশেখর' সংশোধনের ভার থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয়ই গভীর জলে সন্তরণকালে, প্রতাপকে দিয়া শৈবলিনীকে ওরূপ দারুণ শপথ করাইতেন না। তাহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া, কোনও নিভৃত কুটীরে স্থাপন করিয়া আর্টের "নগ্নচিত্র" আঁকিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক ও বোধদয়-বিদ্যাবতী যুবতী-গণকে মোহিত করিয়া দিতেন।

সে যাহা হউক, আমিও মূর্খ সেকেলে স্ত্রীলোকদের মত, পতিভক্তিকে জীবনের সার বলিয়া আর গ্রহণ করিলাম না; শচীনের চিন্তাকে আর বিষবৎ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিলাম না; এক দিন নিজগালে লোহা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবার বাসনা করিয়াছিলাম বলিয়া, নিজ মূর্খতায় মনে মনে লজ্জিত হইলাম।

আমি অনেক সময় ভাবিতাম, শচীন বিবাহ করিয়াছে কি না।

মনে করিতাম, করিয়া থাকে, করুক;—আমার শচীন আমার অন্তরের ধন; আপন অন্তর মধ্যে তাহাকে লুকাইয়া আমি নিত্য তাহার পূজা করিব। কিন্তু এ জীবনে আমার "নারীত্ব" বিফল হইয়া গেল, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

একবার পুরুলিয়ায় গিয়া নীহার দিদির দেখা পাইলাম। শুনিলাম, শচীন কলিকাতায় আইন পড়িতেছে; এখনও বিবাহ করে নাই, বিবাহে তাহার মন নাই। ছেলে এম-এ, বি-এল পাশ করিলে পর বিবাহের বাজারে তাহাকে নীলামে তুলিবেন, এই অভিপ্রায়ে পিতাও পীড়াপীড়ি করেন না। পিতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, শচীনের যে বিবাহে কোনও আগ্রহ নাই, ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম, আমি যেমন তাহাকে ভুলিতে পারি নাই, সে-ও তেমনই আজিও আমাকে ভুলে নাই। মনে বড় আহ্লাদ হইল।

এবার পুরুলিয়ায় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমি মাসখানেক সেখানে থাকিবার পর স্বামী আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন; সেই সময় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শচীন আমাদের বাড়ীতে থাকিত, তার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, আমি আড়ালে থাকিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া শচীনকে দেখিতাম, এবং বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়া সে চলিয়া যাওয়ার পর আমি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। ননীবালা তাঁহাকে এই খবরগুলি দিয়াছিল,—সম্ভবতঃ শৈলরই শিক্ষানুসারে। সেই অবধি স্বামী মাঝে মাঝে শচীন সম্বন্ধে আমাকে রূঢ় কথা বলিতেন, একটা কুৎসিত সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার

এ আচরণে, তাঁহার প্রতি ভক্তি ত আমার ছিলই না· একটু স্নেহ-মমতা যাহা ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাস্নান।

সেবৎসর আষাঢ় মাসে সূর্য্যগ্রহণের সঙ্গে আরও কি কি সব যোগ একত্র হইয়াছিল; পিসীমা আমার স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "চল বাবা, কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসা যাক।" গঙ্গাহীন দেশে আমাদের বসতি, গঙ্গাস্নানের সুযোগ আমাদের দুর্লভ, সুতরাং স্বামী সম্মত হইলেন।

সমস্ত রাত্রি রেলগাড়ীতে কাটাইয়া, পরদিন বেলা নয়টার সময় আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলাম। বেলা দুশটায় গ্রহণ লাগিবে, এক ঘণ্টাকাল স্থিতি। পরামর্শ ছিল, প্রথমে আমরা জগন্নাথ ঘাটে গিয়া গ্রহণের স্নান সারিয়া, তা'র পর সোজা কালীঘাটে চলিয়া যাইব। সেখানে একটা বাসা ঠিক করিয়া, মা'কে দর্শন করিয়া, আহারাদির ব্যবস্থা হইবে। দুই তিন দিন সেই বাসায় থাকিয়া পশুশালা, যাদুঘর, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া দেশে ফিরিব।

শিয়ালদহে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা গঙ্গার ঘাটের

দিকে চলিলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসি নাই; গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়া কলিকাতার বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যতই আমরা গঙ্গার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, পথে মানুষের ভিড় ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—আমাদের নামিতে হইল। স্বামী বলিলেন, উহা বড়বাজার—গঙ্গার ঘাট আর বেশী দূরে নহে, এইটুকু পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

গাড়ী বিদায় করিয়া, আমাকে মধ্যে রাখিয়া, স্বামী ও পিসীমা সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রথমটা আমরা তিন জনেই হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছিলাম। কিন্তু ভিড় বাড়িয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। অনেক কষ্টে আমরা পুনরায় একত্র হইলাম। কিন্তু হইলে কি হইবে, খানিক অগ্রসর হইয়া দেখি, রাস্তার মাঝখানে দড়ি খাটাইয়া, মেয়ে পুরুষের পথ পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। খাকী কোটের বুকে লাল কাপড়ের ফুল আঁটা কয়েকজন যুবক দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামী আমাদের লইয়া পুরুষগণের রাস্তা দিয়াই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই বাবুরা বলিয়া উঠিল—"মা-লক্ষ্মীরা এই দিকে—এই দিকে"—এবং বলপূর্ব্বক আমাদের পৃথক্ করিয়া দিল। পুরুষের সারি পুরুষ দিগের ঘাটে যাইবে, স্ত্রীলোকের সারি স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে যাইবে, এই প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে আমার স্বামী জানিতেন না; এখন জানিয়া তিনি চীৎকার করিয়া আমাদের

বলিয়া দিলেন, "চান ক'রে উঠে ঘাটের চাঁদনিতে তোমরা দাঁড়িয়ে থেক, কোথাও যেও না, এক পা নোড়ো না, ভিড় কম্‌লে আমি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসবো।" পিসীমা উচ্চস্বরে উত্তর করিলেন "আচ্ছা।"

প্রথমটা আমি পিসীমার হাত ধরিয়া ছিলাম—ক্রমে ভিড়ের চাপে হাত ছাড়িয়া গেল। পিসীমা একটু পিছাইয়া পড়িলেন। আমি মাঝে মাঝে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। খানিক পরে আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমে ভিড়ের চাপ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন আর আমি চলিতেছিলাম না, ভিড় আমাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভিড়ের চাপে মাঝে মাঝে পা দু'টি আমার রাস্তা ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িতেছে,—সেই অবস্থায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, পা আবার মাটীতে ঠেকিতেছে। ভাগ্যিস ইহা স্ত্রীলোকের ভিড়—এই ভিড় পুরুষের হইলে কি কেলেঙ্কারীই হইত, ছি ছি!

শুনিয়াছিলাম, ঘাট অধিক দূরে নহে; কিন্তু অনেকক্ষণ চলিলাম, চালিত হইলাম বলিলেই ঠিক হয়। কোথায় যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একটা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন প্রাণটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখিলাম, ঘাটের উপরে চাঁদনি রহিয়াছে; বুঝিলাম, স্নানান্তে এইখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া পিসীমা'র আশায় চাহিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম

না। তখন আমি জলে নামিলাম; অন্য সকলের সঙ্গে আমিও স্নান করিতে লাগিলাম, এবং চারিদিকে চাহিয়া পিসীমাকে খুঁজিতে লাগিলাম। আসিবার সময়, ভিড়ের মধ্যে ২।৩জন স্ত্রীলোকের সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়াছিল; দেখিয়াছিলাম, খাকী কোটের উপর লাল ফুল পরা যুবকেরা ভিড় সরাইয়া তাহাদিগকে কাঁধে করিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছিল। ভাবিলাম, পিসীমারও কি সেইরূপ হইল না কি? আহা, বুড়া মানুষ, দুর্ব্বল শরীর—হায় হায়, এইরূপ অপঘাত মৃত্যুই কি শেষে তাঁর অদৃষ্টে লেখা ছিল।

যাহা হউক, আমি স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া, চাঁদনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও হুড় হুড় করিয়া স্নানার্থিনী রমণীরা আসিতেছে। আমি ভিজা কাপড়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া, দুরু দুরু ব্যাকুলহৃদয়ে পিসীমা'কে খুঁজিতে লাগিলাম।

ক্রমে দেখিলাম, স্নানার্থিনীদিগের প্রবাহ মন্দীভূত হইল, স্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তবে আর পিসীমার আসিবার আশা কি? ভয়ে আমার কান্না পাইতে লাগিল, হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমি সেইখানে শানের উপর বসিয়া পড়িলাম।

বোধ হয়, পুরা আধঘণ্টাকাল আমি এই ভাবে সেই চাঁদনিতে বসিয়া রহিলাম। কখনও মুখ ঢাকিয়া কাঁদি, কখনও ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখি। স্বামী যে বলিয়াছিলেন, স্নানান্তে আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবেন, তিনিই বা বিলম্ব করিতেছেন

কেন? এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রন্দনে ও অন্বেষণে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা আর আমার হুঁস রহিল না।

আমি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিলাম, হঠাৎ আমার কাণে গেল, "কে গো তুমি বসে কাঁদছ? তুমি কি হারিয়ে গেছ?"

পরিচিত কণ্ঠস্বর—আমি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে হঠাৎ আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। যদি ইহা স্বপ্ন না হয়, তবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—শচীন। গায়ে তা'র খাকী রঙের কোট, বুকে লাল কাপড়ের ফুল সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটা, পায়ে বুট জুতা, ধুতিখানি মালকোঁচা বাঁধা। আমরা উভয়ে অবাক্ হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া আছি, হঠাৎ শচীন বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী?"

তিন বৎসর পরে আবার তাহাকে দেখিলাম। সজল নেত্রযুগল তাহার পানে স্থাপন করিয়া বলিলাম, "শচীন!"

শচীন বলিল, "ব্যাপার কি, শীঘ্র বল। এখানে তুমি কি করে এলে?"

আমি ব্যাপারটা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। সে শুনিয়া বলিল, "কিন্তু এটা ত জগন্নাথঘাট নয়, এ যে বাবুঘাট! বুঝেছি, ভিড়ের মধ্যে প'ড়ে জগন্নাথঘাট ছাড়িয়ে তুমি এত দূরে চলে এসেছ। তোমার স্বামী তোমায় জগন্নাথঘাটেই খুঁজবেন, এখানে ত আসবেন না!"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলাম, "তা হ'লে কি হবে শচীন?"

শচীন বলিল, "ভয় কি? আমি একটা ব্যবস্থা করছি।

তোমার স্বামীকে খুঁজে দিতে পারি না পারি, দেশে ত তোমায় পৌঁছে দিতে পারবো! তুমি এক কায কর। এইখানে একটু ব'সে থাক, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি। খবর্দ্দার, এখান থেকে এক পা নোড়ো না, তা হ'লে আর আমি তোমায় খুঁজে পাব না।—" বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন গাড়ী আনিয়া আমায় বলিল, "এস। গাড়ীতে ওঠ।"

আমি উঠিলে, গাড়োয়ানকে "জগন্নাথঘাট" আদেশ দিয়া, শচীন্ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমি যে দিকে বসিয়াছিলাম, তাহার উল্টা দিকে সে বসিল।

গাড়ী জগন্নাথঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন নামিয়া, গাড়ীর নম্বর তাহার পকেটবুকে টুকিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "তুম্ হিঁয়া খাড়া রহো। হাম আভি আতা হ্যায়।"—বলিয়া সে ঘাটের দিকে নামিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি ঘাটে গিয়ে 'মশাই, কার পরিবার হারিয়েছে—কার পরিবার হারিয়েছে'—ব'লে কত চীৎকার করলাম, কৈ, কেউ ত কোন উত্তর দিলে না। তোমার স্বামী এখানে নেই। বোধ হয়, তোমায় খুঁজে না পেয়ে তিনি চলে গিয়ে থাক্‌বেন।"

কি বলিব, কি করিব, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। আমি মাথাটি হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

শচীন রাস্তায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার পর গাড়ীর খড়খড়িগুলা একে একে সব উঠাইয়া দিয়া, গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো বউবাজার।" বলিয়া সে উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্ধুর আশ্রয়ে।

আমি যে দিক্‌টায় বসিয়াছিলাম, শচীন এবারও তাহার বিপরীত দিকেই বসিল। বসিয়া বলিল, "বিনি, তুই বড় হয়েছিস্। আমি প্রথমটা তোকে দেখে চিন্‌তেই পারিনি রে!"—পুরুলিয়াতে ইদানী শচীন আমাকে, শৈলকে 'তুই' বলিয়াই কথা কহিত।

উত্তর করিলাম, "চিরকালই কি ছোট থাকবো?"

শচীন বলিল, "তোর বিয়ের খবর আমি বউদিদির কাছেই শুনেছিলাম। ছেলেপিলে হয়েছে?"

"না।"

"কেন?"

এই 'কেন'র আমি কি উত্তর দিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, নীরবে অবনত মুখে বসিয়া রহিলাম।

খড়খড়িগুলার কোন কোনও পাখী ভাঙ্গা ছিল, তাই সেগুলি

বন্ধথাকা সত্ত্বেও ভিতরে কিছু আলো ছিল। আমি একবার মুখ তুলিয়া দেখিলাম, শচীন আমার পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাড়ী কোথায় যাচ্ছে ?"

"আমার বাসায়।"

"তোমার ত মেসের বাসা। সেখানে পাঁচজন পুরুষমানুষের মধ্যে আমায় রাখবে কোথায় ?"

শচীন বলিল, "না রে, সেখানে কি তোকে রাখবো ? আমার জিনিষপত্র কতক নেবার জন্য যাচ্ছি। তার পর আর এক যায়গায় নিয়ে গিয়ে তোকে খাওয়াব-দাওয়াব, তার পর দুজনে পরামর্শ ক'রে যা করতে হয় করা যাবে।"

ভাবিলাম, শচীন আমায় কোথায় লইয়া চলিল ? ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা গুরু-গুরু করিতে লাগিল।

শচীন খড়খড়ির ফাঁক দিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া ছিল। কিৎক্ষণ পরে হাঁকিল, "এই কোচম্যান, ঐ সামনে বাড়ী রাখ্খো।"

গাড়ী দাঁড়াইল। শচীন বলিল, "তুমি চুপটি ক'রে গাড়ীর মধ্যে ব'সে থাক। আমি উপরে গিয়ে, আমার বাক্স আর বিছানাটা নিয়ে আসি।"

গাড়ীর দরজা খুলিয়া শচীন নামিয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। খড়খড়ির ফাঁকে দেখিলাম, এক জন চাকর একটা মাঝারি আকারের বাক্স ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছে। বাক্সটা সে গাড়ীর ছাদে তুলিয়া দিল। শচীন তাহাকে বলিল, "বিছানা আউর সোরাইঠো লে আও জলদি।" চাকর চলিয়া গেলে

গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "আব কাঁহা জানে হোগা বাবু?" শচীন বলিল, "শেয়ালদা ষ্টেশনকে পাশ।" চাকর ফিরিয়া আসিলে বিছানার বাণ্ডিলটা ছাদে দিয়া, সোরাই হাতে করিয়া শচীন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

শচীন বলিল, "শেয়ালদা ষ্টেশনের কাছে যাত্রিনিবাস ব'লে একটা বাঙ্গালী হোটেল আছে। কেউ পরিবার নিয়ে এলে, তাদের থাকবারও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। তোমার স্বামীকে খোঁজবার জন্যে ২।১ দিন যে কলকাতায় থাকতে হবে, সেইখানেই তোমায় রেখে দেবো। আর কোনও স্থান নেই। সেখানকার কোনও ঝি-টি তোমায় যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি আমাকে স্বামী ব'লেই পরিচয় দিও। নইলে, তারা অজ্ঞ লোক, অকারণ একটা মন্দ কিছু ভাবতে পারে। বুঝেছ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, শচীনের মতলবটা কি?

কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শচীন বলিল, "সকালে এক পেয়ালা চা আর একটু মোহন-ভোগ খেয়ে ভলন্টিয়ারি করতে বেরিয়েছিলাম। তুমি ত তাও খাওনি, তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়?"

আমি বলিলাম, "মেয়েমানুষের আবার ক্ষিদে!"

শচীন বলিল, "নাঃ, তারা ত আর মানুষ নয়!"

আমি বলিলাম, "ক্ষিদে-তেষ্টা তাদের দমন করতে শিখতে হয়।"

শচীন বলিল, "বিনি, তুই এই নবযুগের নূতন আলোর দিনে বলি, মেয়েমানুষকে ক্ষিদে-তেষ্টা দমন করতে শিখতে হয়? কেন তারা দমন করবে? কি অপরাধে, শুনি? ও সব মতটত মহাভুল—অত্যন্ত সেকেলে। 'নারী-সমস্যা'র ত এখন মীমাংসাই হয়ে গেছে। দেহধর্ম্মের বা মনোধর্ম্মের কোনও ক্ষুধা দমন করার চেষ্টাই মহামূর্খতা; তার তৃপ্তি সাধনই পুরুষের যথার্থ পুরুষত্ব, নারীর আদর্শ নারীত্ব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি বই লেখ না কি?"

"কেন?"

"বইয়ে এই রকম সব কথা দেখতে পাই।"

শচীন বলিল, "লিখি না, পড়ি। আজকাল কত সব ভাল ভাল বই বেরুচ্চে, সে সব তুই পড়েছিস্? হ্যাঁ—তুই যখন পুরুলিয়াতে ছিলি, তখনই ত তোরা ক' বোনে বেশ লেখাপড়া করতিস্ দেখেছি।"—বলিয়া কয়েকখানা পুস্তকের নাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সব বই তুই পড়েছিস্?"

আমি বলিলাম, "পড়েছি। দু'বার তিনবার ক'রে পড়েছি।" —বহিগুলির নাম আজ সাত বৎসর পরে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, যদিও তখন সেগুলি সাহিত্যাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, নবযুগের বিজয়স্তম্ভ, মনস্তত্ত্বের মনুমেণ্ট বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, লেখকগণ "অমর" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির নাম এখন আর শুনা যায় না। এমন কি, গুরুদাস বাবুদের ক্যাটলগে অথবা চৈতন্য লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকাতেও দেখিতে পাই না।

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নারীর অধিকার সম্বন্ধে তোর মত কি, বল্। আমাদের সেই মা-দিদিমাদের, বঙ্কিমবাবু-টাবুদের মতই ঠিক, না আজকাল এই এঁদের মতই ঠিক ?"

আমি বলিলাম, "আজকালকার মতই ত আমার ঠিক ব'লে মনে হয়।"

শচীন পুলকিত হইয়া বলিল, "বেশ বেশ! শুনে সত্যি বড় সুখী হলাম, বিনি"—বলিয়া সে আমার স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া দিল। আজ এই প্রথম সে আমায় স্পর্শ করিল।

ক্রমে গাড়ী যাত্রিনিবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন আমাকে গাড়ীতে রাখিয়া, ঘর ঠিক করিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে হোটেলের একজন ভৃত্য সহ ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য গাড়ীর ছাদ হইতে বাক্স-বিছানা নামাইল। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া শচীন আমাকে নামাইয়া লইল। আমি ঘোমটা দিয়া, তাহার স্ত্রী সাজিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তেতালায় উঠিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, যাহা সাজিয়াছি, সত্যই যদি আমি তাহাই হইতাম, তবে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর কে থাকিত ?

উপর-ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘোমটা তুলিলাম। দেখিলাম, ঘর-খানি মাঝারি আকারের; একধারে একখানি কেওড়া-কাঠের তক্তপোষ, অপর দিকে একটি ছোট গোল টেবিল, একখানি চেয়ার, দেওয়ালে একটি আর্সি টাঙ্গানো। রাস্তার ধারে চিক-ফেলা ছোট বারান্দাটি এই ঘরখানিরই নিজস্ব; অন্য কোনও ঘরের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।

চাকর বিছানা-বাক্স নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, খাবার-টাবার কিছু আনতে হবে কি ?"

শচীন বলিল, "আনতে হবে বৈ কি। তোদের ম্যানেজার বাবু ত বল্লে, এত বেলায় ভাত কোথা পাব। এই টাকা নে।"—বলিয়া, কি কি আনিতে হইবে, শচীন তাহা বলিয়া দিল।

চাকর টাকা লইয়া চলিয়া গেল। এক জন মধ্যবয়স্কা, কপালে উল্কিপরা ঝি আসিয়া বলিল, "বউমা, চানটান করবে কি ?"

আমি বলিলাম, "না, এই তো আমরা গঙ্গাস্নান ক'রে আসছি।"

ঝি বলিল, "কত দিন তোমাদের থাকা হবে ?"

শচীন বলিল, "দুই এক দিন। কা'ল কি পরশু আমরা দেশে ফিরে যাব। এই সোরাইটেতে জল ভ'রে এনে দাও ত ঝি !"

ঝি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ বউমা, খাবারটাবার দরকার হ'লে, আমাকেই বরং আনতে দিও। খোট্টা বেটারা আমাদের বাঙ্গালী-পছন্দ খাবার কি কিনতে জানে ?"—বলিয়া সোরাই লইয়া চলিয়া গেল।

শচীন জামা ছাড়িয়া, বিছানার বাণ্ডিলের দড়ি খুলিতেছিল; বলিল, "দেখ, আমি স্নান করবো। যদিও সকালবেলা বাসা থেকে স্নান ক'রে বেরিয়েছিলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে ভলণ্টিয়ারি ক'রে ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। তুমি আমার কোটটা আর গেঞ্জিটা ঐ বারান্দায় টাঙ্গিয়ে দাও। আর এই চাবি নাও, বাক্স থেকে আমার ধুতি, তোয়ালে, সাবান বের করে দাও।"

বাক্স খুলিয়া জিনিষগুলি বাহির করিয়া দিলাম, শচীন স্নানার্থ

গমন করিল। আমি নিজ বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, আধ-ময়লা একখানি মিলের সাড়ী পরিয়া সমস্ত রাত্রি রেলে আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গায়েই শুকাইয়াছি; এ রকম পেতনীর মত বেশে শচীনের সাম্‌নে থাকিতে আমার লজ্জা করিতেছিল। তাই আমি তার বাক্স হইতে একখানি ধোয়া কালোপেড়ে দেশী ধুতি বাহির করিয়া পারিলাম। সোরাইয়ের জলে মুখটা, হাত দু'খানা ধুইয়া ফেলিলাম; শচীনের চিরুণী-বুরুষ লইয়া, দেওয়ালে টাঙ্গানো সেই আর্‌সির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া, শচীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শচীন ভিজা তোয়ালে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, হাসিভরা চোখে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "বাঃ, ধুতি প'রে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে! ও ধুতির আজ জন্ম সার্থক হ'ল!"—তাহার কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলাম।

চাকর খাবার আনিল। ঝি আসন, থালা প্রভৃতি দিয়া গিয়াছিল। শচীনকে খাবার দিলাম। আহারান্তে তক্তপোষের উপর বসিয়া সে পাণ ও সিগারেট সেবন করিতে বসিল।

তাহার পাতে আমি খাইতে বসিলাম। আমার খাওয়া হইলে, শচীন বলিল, "এইবার আমি বেরুই, তুমি দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে একটু ঘুমোও।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথা যাবে?"

"থানায় থানায় গিয়ে একবার খোঁজ নিতে হবে, তোমার স্বামী কোনও থানে ডায়েরি করিয়েছেন কি না। যদি করিয়ে থাকেন,

তবে তাঁ'র ঠিকানাও পাব। কিংবা পুলিসকে জানিয়ে আসতে পারবো, তুমি অমুক ঠিকানায় আছ।"

আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি এখানে একলা থাক্‌বো?"

"দিনের বেলা, ভয় কিসের?"—বলিয়া শচীন বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুকের হার।

আমি ঘুমাইলাম। কা'ল সারারাত্রি জাগরণ, আজ ভিড়ে কষ্টের পর, শরীর আমার অবশ হইয়া গিয়াছিল—খুব ঘুমাইলাম।

ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া, শচীনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা হইল, ঝি আসিয়া ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল। প্রায় ৮টার সময় শচীন ফিরিল। বলিল, কোনও থানায় কেহ আমার সম্বন্ধে কোনও ডায়েরি করায় নাই। অবশেষে সে কালীঘাটে গিয়াছিল। প্রত্যেকটি যাত্রীবাসা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিয়াছে, কোথাও আমার স্বামীর সন্ধান পায় নাই।

চাকরকে ডাকিয়া শচীন দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া শচীন বলিল, "এখন উপায় ? তোমায় কি তোমার স্বামীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে আস্‌বো ?" আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, "যদি বল, আমাদের বাড়ীতে, নীহার বউদির কাছেও তোমায় রেখে আসতে পারি !"

তথাপি আমি চুপ করিয়া আছি দেখিয়া শচীন বলিল, "কি ভাবছ তুমি ?"

"আমি ভাবছি, তুমি আমায় স্বামীর বাড়ীতেই রেখে এস, আর নীহারদির কাছেই রেখে এস, তুমি আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ, এক দিন এক রাত তোমার সঙ্গেই আমি ছিলাম, এ কথা শুন্‌লে আমার স্বামী কি ভাববেন ?"

চা আসিল। শচীন এক পাত্র লইয়া অন্য পাত্র আমায় দিতে চাহিল। আমি চা খাই না শুনিয়া সে নিজেই উভয় পাত্র গ্রহণ করিয়া বলিল, "এতে আর দোষটা কি ? এক জন ভদ্রলোক যদি এ রকম অসহায় অবস্থায় কোনও বিপন্না স্ত্রীলোককে পায়, সে কি তাকে তার বাড়ী পৌছে দেবে না ?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি যে !"

"কেন, আমি কি দোষ করেছি ?"

"তুমি না কর, আমি যে করেছিলাম। আর, সে কথা যে আমার স্বামীর কাণেও উঠেছে।"

শচীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা ?"

আমার ভারি লজ্জা করিতেছিল, তথাপি কোনও মতে আমি বলিলাম, "বিয়ের পর, আমার স্বামী একবার পুরুলিয়াতে এসে-

ছিলেন। ননীবালা তখন ন' বছরের। আমার স্বামী রঙ্গ ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর বিনোদ দিদি আমাকে কি রকম ভালবাসে বল্ দেখি।' ননী বলেছিল, 'না, তোমাকে ভালবাসে না, শচীনদাকে ভালবাসে।' স্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শচীনদা কে?' ননী বলেছিল, 'সেই যে আমাদের বাড়ী থাকৃতো। তার সঙ্গে বিনোদ দিদির বিয়ে হবার কথা হয়েছিল কি না। দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখত, দু'জনে হাসাহাসি করত, তার পর যখন বিয়ে ভেঙে গেল, সে চ'লে গেল, দিদি সেদিন কেঁদে একবারে কুলুক্ষেত্র করেছিল! তার পরেই ত তোমার সঙ্গে দিদির বিয়ে হ'ল কি না!

শচীন বলিল, "আচ্ছা দুষ্ট মেয়ে ত! তা, এ রকম সব কথা সে বানিয়ে বল্লে কেন?"

"বানিয়ে বলবে কেন?"

"তবে কি সত্যিই তুমি—"

"সত্যিই আমি"—বলিয়া মুখ নত করিলাম; বোধ হয়, আমার গাল দুটিও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীন কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে আমিও বলি। সেই পুরুলিয়াতে, যখন আমি সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে দিন দিন সুস্থ সবল হয়ে উঠ্ছিলাম, তোমায় যে আমি কি চোখে দেখেছিলাম, তা বলতে পারিনে। বাবা যখন চিঠি লিখলেন যে, তিন হাজার টাকার কমে তিনি কিছুতেই আমার বিয়ে দেবেন না, আমায় চলে আসতে হুকুম দিলেন, তখন আমার মাথায় যেন

বজ্রাঘাত হ'ল। তোমার আশা জন্মের মত ছেড়ে, আমিও চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সেখান থেকে চলে এসেছিলাম। এত দিনেও কি আমি তোমায় ভুলতে পেরেছি? এ তিন বছরের মধ্যে বোধ হয় এমন একটি দিন যায় নি, যে দিন তোমার কথা আমার মনে পড়েনি।"

শচীনের মুখে এই কথা শুনিয়া, পুলকে আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর আশা আমি একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিলাম। একেই ত শচীন সম্বন্ধে আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ! শচীন যদি তাঁহাকে খুঁজিয়াও পায়, অথবা সঙ্গে করিয়া আমায় দেশে রাখিয়া আসে, তথাপি তিনি যে আমায় আর গ্রহণ করবেন, এ সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে আর মিছা কেন সে চেষ্টা? বিশেষ, সেই স্বামী! কেন? মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, নিজেকে তাঁহারই পায়ে বলি দিতে হইবে নাকি? "নারী-সমস্যা"র ত মীমাংসাই হইয়া গিয়াছে; "নারীর অধিকার" সম্বন্ধে এখন ত আর কোনও সন্দেহই নাই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, শচীন আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবা আমার বিয়ে দেবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোমায় ভুলতে পারিনি বলেই আমি বিয়ে করতে রাজি হই নি। কিন্তু তুমি ত বেশ মনের সুখে স্বামীর ঘর করছিলে!"

আমি বলিলাম, "তা তুমি বলবে বৈ কি!"

শচীন ভারি গলায় বলিল, "বল্‌বো না কেন? তবে কি, তুমিও কি আমায় ভুলতে পারনি, বিনোদ?"

ইচ্ছা হইল বলি, "ভোলা কি যায় প্রিয়তম?"—কিন্তু লজ্জায় শেষ শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। চোখের জল চোখে চাপিয়া মাথাটি হেঁট করিয়া বলিলাম, "ভোলা কি যায়? পতিভক্তি পতিসেবা করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি, পারি নি। বিজয়ার রাতে যখন তাঁ'কে প্রণাম করেছি, মনে হয়েছে, যেন তোমায় প্রণাম করছি। তিনি যদি কখনও আমায় আদর করেছেন, তখন চোখ বুজে কল্পনা করেছি, যেন তুমিই আমায় আদর করছ।"

শচীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখেও বোধ হয় জল আসিতেছিল, ল্যাম্পের আলোকে সে দু'টি চক্‌চকে দেখাইল।

ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ভাত অন্‌বে কি? রান্না বান্না হয়ে গেছে।"

রাত্রি প্রায় তখন ৯টা। শচীন ভাত আনিতে বলিল। ঝি, ঠাকুরকে বলিয়া, আবার ফিরিয়া আসিল, ঠাঁই করিয়া, আসন বিছাইয়া দিল। ক্ষণকাল পরে ঠাকুর অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দুই থালা ভাত আনিয়া, ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে শচীন বলিল, "আচ্ছা, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, আমি তবে এখন বাসায় যাই। তুমি খেয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে থেক। কা'ল সকালে আবার আমি আসবো; কি করা উচিত, দু'জনে ব'সে পরামর্শ করা যাবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার বিছানা ত এখানে। সেখানে গিয়ে তুমি শোবে কিসে?"

শচীন বলিল, "সেখানে আর একটা তোষক, বালিস আমার আছে।"

আমি বলিলাম, "তা যেন আছে। কিন্তু, আমি কি এখানে একলা কখনও থাকতে পারি? আমার ভয় করবে না বুঝি?"

শচীন বলিল, "তোমার ভয় করবে?"

আমি অভিমানের স্বরে বলিলাম, "না, করবে না! আচ্ছা, তুমি যাও না, কা'ল এসে দেখবে, চোরে আমায় গলা টিপে মেরে রেখে গেছে।"—বলিয়া আমি চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইতে লাগিলাম। ইহা আমার অভিনয় নহে,—এই অপরিচিত নির্ব্বান্ধব স্থানে রাত্রিতে একা থাকিতে হইবে শুনিয়া সত্যই ভয়ে আমার শরীর কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া শচীন বলিল, "ছিঃ, কেঁদ না। একলা যদি তোমার ভয় করে, আমি থাকছি না হয়, তা'র জন্যে আর কি? কেঁদ না, কেঁদ না, চুপ কর!"—বলিয়া চক্ষু হইতে আমার হস্ত অপসারিত করিয়া লইল।

আমি চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আমি ত জন্মের মতই গেছি। বাপ নেই, মা নেই, স্বামীর ঘরে আমার জায়গা নেই। এখন তুমিও যদি আমায় ত্যাগ ক'রে যাও, তা হলে আমার দশা কি হবে?"

শচীন আমার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া, আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তোমায় আমি ত্যাগ করবো, বিনোদ? কখনই নয়। আজ তিন বৎসর তোমার নাম জপ ক'রে কাটিয়েছি। দেবতা যদি সদয় হয়ে তোমায় মিলিয়ে দিলেন, তোমায় আমি ত্যাগ

করব? নিশ্চয়ই না। তোমাকে আমি বুকের হার ক'রে রেখে দেবো।"

শেষের দিকের কথাগুলা বলিবার সময় শচীনের গলা ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি বুঝিলাম, বিধাতা সদয় হইয়া এত দিনে আমার "নারীত্ব" সফল করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শচীনের মৃত্যু।

তাহার পর তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন—সেই সর্ব্বনাশের দিন—সোমবার, ২২শে বৈশাখ! তিনটি বৎসর মাত্র শচীনকে পাইয়াছিলাম, সুখের মুখ দেখিয়াছিলাম,—কিন্তু সে সুখে আমার বাজ পড়িল।

এক দিন তুমি বলিয়াছিলে, আমায় তোমার বুকের হার করিয়া রাখিবে—রাখিয়াছিলেও তাই—তবে আজ তোমার সেই কত সাধের কত যত্নের বুকের হারকে, পথের ধুলায় ফেলিয়া দিয়া কোথায় চলিলে, প্রাণাধিক?

আর কি লিখিব? কিছুতেই কিছু হইল না। ভোর রাত্রে, আমার জগৎ আঁধার করিয়া, আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, শচীন চক্ষু বুজিল। আমি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, মাটীতে লুটাইয়া

পড়িলাম। সে চীৎকার শুনিতে পাইয়া, নবীন বাবুর স্ত্রী কমলা দিদি, কেদার বাবুর স্ত্রী নিরুপমা ছুটিয়া আসিয়া আমায় তুলিয়া, জড়াইয়া ধরিল।

সারাটা দিন যে কি করিলাম, কি হইল, সে সকল আমি ভাল স্মরণ করিতে পারি না। দাহকার্য্য সমাধা হইবার পর নিমতলার ঘাটে আমায় স্নান করাইয়া, কমলা দিদি আমার হাতের কাচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া, সাঁথির সিন্দূরের দাগ গঙ্গামৃত্তিকা ঘষিয়া ধুইয়া দিয়া, ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া, আমায় সাদা থান পরাইয়াছিল, তাহা বেশ স্মরণ আছে। তাহার পর গাড়ী করিয়া আমায় বাড়ী আনিয়াছিল এবং পীড়াপীড়ি করিয়া সন্ধ্যাবেলা আমায় একটু গরম দুধ খাওয়াইয়াছিল, তাহাও আমার মনে আছে।

দুই তিন দিন পরে কমলা দিদি বলিল, "যা অদৃষ্টে ছিল, তা তো হয়ে গেল। তোমার শ্বশুরকেই না হয় একখানা চিঠি লেখ। এ বিপদ শুনলে কি এখনও তাঁর মনে দয়া হবে না?"

শিয়ালদহ যাত্রিনিবাস হইতে যখন এই চোরবাগানের বাড়ীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া আমরা আসিয়া স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে বাস করিতে লাগিলাম, তখন সে বাড়ীর অন্য ভাড়াটিয়া গৃহস্থদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, বাপ-মা'র অমতে আমার স্বামী আমাকে বিবাহ করায়, তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন; তখন তিনি চাকরী যোগাড় করিয়া এখানে কলেজে পড়িতে থাকেন, বিবাহের পর এ কয় বৎসর আমি আমার বিধবা মার কাছে থাকিতাম; স্বামী মাঝে মাঝে গিয়া আমায় দেখিয়া

আসিতেন। সম্প্রতি মার মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ায় তিনি আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। আমার এই কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মত হইয়াছিল। তখন অবশ্য শচীনের পিতা কিছুই জানিতে পারেন নাই; পরে জানিয়াছিলেন এবং জানিয়া শচীনকে সত্যই তিনি ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

কমলার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "তাই না হয় লিখি তাঁকে চিঠি।"

কমলা বলিল, "তোমার স্বামী টাকা-কড়ি কি রেখে গেছেন, বল দেখি?"

আমি বলিলাম, "কি আর রেখে যাবেন, দিদি? নতুন উকীল, এই ত এক বছরমাত্র পাশ ক'রে ছোট আদালতে বেরুচ্ছিলেন। যা আনছিলেন, তাতে ভাত-কাপড় ঘরভাড়া কুলোতো না, তাই সন্ধ্যেবেলা প্রাইভেট টিউসনি করতেন। আমার গায়ে ২।৩ খানি যা গহনা ছিল, তাও তাঁর অসুখের সময় বিক্রী করে ডাক্তার দেখাতে হ'ল। সবই ত জান দিদি!"

কিন্তু কাহাকেও আমি পত্র লিখিলাম না, কোন্ মুখে লিখিব? কি করিয়া নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইব, ইহাই আমি দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম। অবশেষে স্থির করিলাম, কোনও ভদ্রপরিবারে ঝি-গিরি করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলা কাটাইয়া দিব।

যে নাপিতানী আমাদের কামাইতে আসিত, তাহারই সাহায্যে আমি একটি চাকরীর যোগাড় করিলাম। জিনিষপত্র যাহা

বিক্রয় করিয়া, ঘরভাড়া মিটাইয়া দিয়া, সেই নাপিতানীর সহিত আমি গিয়া ঝি-গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। অদৃষ্টে শেষে এও ছিল!

গৃহস্বামী প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁহার কয়লার আড়ত ছিল। বড় ছেলে মণিমোহনকে তিনি একটি স্বতন্ত্র কারবার করিয়া দিয়াছিলেন। সে-ও দুই পয়সা আনিত। গৃহে তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুসন্তান ছিল। তাহার আর দুইটি ভাই ছিল, তাহারা তখন নাবালক। সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। গৃহিণী আমায় বেশ যত্ন করিতেন; কিন্তু বউছুঁড়ী আমাকে দেখিতে পারিত না। সর্ব্বদা আমার কাযে দোষ ধরিত এবং কড়া কড়া শুনাইয়া দিত। তাহার কারণ বোধ হয়, অন্য সকলে আমায় ঝি বলিয়া ডাকিলেও, তাহার স্বামী মণিবাবু আমায় নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এক দিন আমি আড়ালে থাকিয়া শুনিলাম, গৃহিণী তাঁহার ছেলেকে তিরস্কার করিতেছেন। মণিবাবু বলিলেন, "আহা, ভদ্রলোকের মেয়ে, এক দিন একজন উকীলের পরিবার ছিল, অবস্থাগতিকে এসে ঝি-গিরি করছে, ওকে ঝি ঝি ব'লে ডাকাটা কি উচিত হয় মা?" আমার প্রতি মণিবাবুর এই অনুকম্পায়, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনটি ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতেই মণিবাবুর এই অনুকম্পা ভিন্ন আকার ধারণ করিল। এক দিন, অন্যের অসাক্ষাতে, তিনি আমার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার ভাগ্য পরিবর্ত্তন।

আরও এক বৎসর কাটিয়াছে। এ একবৎসর আমি কলিকাতায় যে পল্লীতে বাস করিয়াছি তাহার আর নামোল্লেখ করিব না। "পিতৃ আদেশে কারবার সম্পর্কে এক সপ্তাহের জন্য বোম্বাই যাইতেছি" বলিয়া সেই যে মণি চলিয়া গেল, আর ত আসিল না! যখন দেখিলাম, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সে আর আসে না, তখন সংবাদ জানিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইলাম। দুই তিন দিন পরে চর আসিয়া জানাইল, বোম্বাই যাইবার কথা ডাহা মিথ্যা, মণিবাবু কোথাও যান নাই, বরাবর কলিকাতাতেই আছেন, তাঁহার একজন নূতন জুটিয়াছে। আমি তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, সে আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে! বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম; তাহার বিরহে নহে, কারণ, তাহার প্রতি আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা বা স্নেহ ছিল না। তাহাদের বাড়ী থাকিতে, তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাটুকু এবং প্রথম প্রথম তাহার প্রতি যে আকর্ষণটুকু জন্মিয়াছিল, এখানে আসিয়া, এই এক বৎসর তাহার ব্যবহারে, দিনে দিনে আমার মন হইতে সে সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি কাঁদিতেছিলাম, আমি কি ছিলাম, কি হইলাম ভাবিয়া—আমার উপায় এখন কি হইবে ভাবিয়া।

বাড়ীউলী এবং এই গৃহের অন্যান্য ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকগণ আমার কাছে আসিয়া সর্ব্বদা আমায় সান্ত্বনা দিত এবং উপায় নির্দ্দেশ করিত।

ক্রমে আমার টাকা ফুরাইল। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তখন বাধ্য হইয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট উপায়ই আমাকে অবলম্বন করিতে হইল।

* * * *

নানারূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, আমার জীবন অতি বাহিত হইতে লাগিল। কিছুকাল বা; দিনের পর দিন কালিয়া পোলাও মাছের মুড়া চলে; সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া, বারাণসী শাড়ীর বাহার দিই; আবার কিছু কাল বা ঐ সমস্ত বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করি; দুই পয়সার কুচা চিংড়ি আনাইয়া "বাটিচর্চ্চড়ি" করিয়া ভাত খাই। ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরিয়া যায়, গহনাপত্র খালাস করিয়া আনি, আবার কালিয়া পোলাও মাছের মুড়া, বক্সে বসিয়া থিয়েটার দেখা আরম্ভ হয়। এইরূপে জীবনের আরও সাতটি বছর কাটিয়া গেল। কিন্তু সুখে কাটিল কি?

জীবনের শেষের সাতটি বৎসর কি দুঃখেই যে আমার কাটিল, তাহা সেই সর্ব্বলোকসাক্ষী ব্যতীত আর কে জানিবে? শেষের বৈ কি, কারণ ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন, আমার এই রোগ শিবের অসাধ্য—তিন মাসের মধ্যেই আমার ইহলোকের সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। ইহলোকের যন্ত্রণা ত শেষ হইবে;—কিন্তু পরলোক?

পরলোক আছে কি না কে জানে? যদি থাকে? তবে সেখানে আমার কি দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, দেহের স্বল্পাবশিষ্ট রক্তও যেন জল হইয়া যায়।

এদিকে তিন বৎসর আমি অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাই নাই—বরং সাধারণ গৃহস্থবধূর অপেক্ষা সে বিষয়ে প্রাচুর্য্যই ভোগ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব নহি। কিন্তু মনের সুখ? গহনা গায়ে দিয়া, আড়ং ধোলাই জড়িপাড় শাড়ী ব্লাউজ পরিয়া থাকিয়াও, মনে সর্ব্বদা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ডাক্তার বাবু বলেন, শুধু শারীরিক অত্যাচার নহে, ঐ মানসিক অশান্তিও আমার এই ক্ষয় রোগের একটা প্রধান কারণ।

দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রহণে যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলাম, তখন হারাইয়া না গিয়া, গঙ্গায় যদি ডুবিয়া যাইতাম, তাহা হইলে উঃ—কি সৌভাগ্যই আমার হইত। ডুবিলাম না—"নারীর অধিকার"—অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার অধিকার—লাভ করিলাম।

কলিকাতায় প্রথম তিন বৎসর, শচীনের স্ত্রী সাজিয়া যে তিন বৎসর যাপন করিয়াছি, সেই সময়টা আমার সুখেই কাটিয়াছিল সত্য। কিন্তু সে-ও অনাবিল সুখ নহে। আধুনিক মতানুযায়ী, আমি আমার "নারীত্ব সফল" করিতেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি সর্ব্বদা বহিয়া যাইত, তাহার হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতাম না। আমাদেরই মত গরীব যে কয়টি গৃহস্থপরিবার সে বাড়ীতে ঘরভাড়া লইয়া

বাস করিত, তাহাদের নিকট আমাদের যে কাল্পনিক পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিল—অবিশ্বাসের কোনও কারণই বর্ত্তমান ছিল না। তথাপি আমার মনে হইত, হায়, ইহারা যাহা, আমি ত তাহা নহি!

যাক্, সে সকল কথার অনুশোচনায় আর ফল কি? এখন আমার এই দুঃসময় লজ্জাময় জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করিয়া ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর ইহা যেন তিনি জনসমাজে প্রচারিত করিবার জন্য যত্ন করেন। "নবযুগের নূতন আলোক" বলিয়া যাহা এখন কথিত হইতেছে, তাহা যে "আলোক" নহে—তাহা যে আগুন, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই, আমার সেই আগুনে পুড়িয়া মরিবার ইতিহাস আমি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি; ইহা পাঠ করিয়া, যদি বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের একটি মেয়েও, ভুলপথে পা দিতে দিতে, পা উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া অসে, তবে পরলোকে আমার আত্মা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিবে।

অদৃষ্ট-পরীক্ষা



প্রথম পরিচ্ছেদ।

চোগা চাপকান-পরিয়া, শামলা মাথায় দিয়া, নব্য উকীল শ্রীযুত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ হাতে করিয়া হুগলি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছিতেই ট্রেণখানি আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি কামরায় দুইজন ইংরাজ বসিয়া আছে, অন্যটি খালি। সুতরাং সেই খালি কামরাটিতেই তিনি উঠিয়া পড়িলেন। জানালাগুলি খুলিয়া, রুমাল দিয়া চামড়ার গদির ধুলা ঝাড়িয়া মনোমত স্থানটিতে বসিতেই ঘণ্টা হইল, গাড়ির সবুজ নিশান উড়িল, এঞ্জিনের বাঁশি বাজিল, ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিল। হেমন্ত বাবু তখন পায়ের জুতা খুলিয়া, ছিদ্রবহুল মোজা-সংযুক্ত চরণ দু'খানি বেঞ্চির উপর ছড়াইয়া দিয়া, আরাম করিয়া বসিয়া, মক্কেলের উপহার সিগারেটের একটি আধখালি প্যাকেট বাহির করিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

হেমন্ত বাবু বর্দ্ধমানে ওকালতী করিয়া থাকেন। আজ তিন বৎসর কাল আদালতে যাতায়াত করিতেছেন, কিন্তু উপার্জ্জন

আশানুরূপ হইতেছে না। অথচ গৃহে স্ত্রী, দুইটি কন্যা, একটি বিধবা ভগিনী এবং বৃদ্ধা মাতা। বাড়ীখানি পৈতৃক, ভাড়া দিতে হয় না, তিন মাস অন্তর মিউনিসিপ্যাল টেক্স দিয়াই খালাস—ঐ যা একটু সুবিধা। কিন্তু কঠোর মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়াও, মাসে একশোটি টাকার কমে সংসারটি কিছুতেই চলে না। মাঝে মাঝে পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। পরিবারস্থ কাহারও পীড়াদি হইলে, অথবা অন্য কোনওরূপ অভাবিতপূর্ব্ব দায় উপস্থিত হইলেও পুঁজিতে হাত পড়ে। এই প্রণালীতে সেই পুঁজিও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। হুগলিতে একটি মোকর্দ্দমা পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছিলেন। একদমে পঁচিশটি টাকা ফী পাইয়া মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল। দশদিন পরে আবার তারিখ পড়িয়াছে, আবার আসিতে হইবে। মোকর্দ্দমাটি এখন কিছুদিন চলিলেই মঙ্গল।

ট্রেণ, ছোট ছোট ষ্টেশনকে গ্রাহ্য না করিয়া, নিজ আভিজাত্য গর্ব্বে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমন্ত বাবুর সিগারেট শেষ হইল, গোটা দুই ছোট ষ্টেশনও পার হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া গোসল কামরায় প্রবেশ করিলেন। হাতে মুখে জল দিয়া রুমালে মুখ মুছিতেছেন, এমন সময় উপরে জালতি র‍্যাকের দিকে তাঁহার নজর পড়িল। দেখিলেন, ময়লা মোটা কাপড়ে বাঁধা একটি পুলিন্দা। "কাহারও মোকদ্দমার কাগজপত্র নাকি?"—মনে এই ভাবিয়া পুলিন্দাটি তিনি নামাইলেন। গোসল কামরা হইতে বাহির হইয়া, স্বস্থানে আসিয়া বসিয়া, সেটি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিতে লাগিলেন। পুলিন্দাটি খুলিবেন, অথবা বর্দ্ধমানে নামিয়া ষ্টেশনে মাষ্টারের জিম্মা

করিয়া দিবেন, ইহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে হইল, ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দেওয়ায় একটা বিপদ আছে। নিজ নামধাম লিখাইয়া দিতে হইবে। পরে, যাহার পুলিন্দা সে যদি বলে, উহার মধ্যে আমার এত টাকা ছিল, অথবা অমুক মূল্যবান দ্রব্য ছিল, তাহা নাই, তখন কি করিয়া আমি প্রমাণ করাইব যে, আমি উহা আত্মসাৎ করি নাই? কামরায় এমন একজন সহযাত্রীও নাই যে, আমার সাধুতার বিষয় সাক্ষ্য দিবে। অবশ্য প্রমাণের ভার বাদীর উপরে, আদালতে না হয় আমি বেকসুর খালাস পাইয়াই আসিলাম। কিন্তু বদনামটা যাইবে কোথায়? সুতরাং কি করা যায়?—এ আপদ যেখানে ছিল, সেই খানেই রাখিয়া দিব কি? কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে? শেষ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাড়ী সাইডিং-এ গেলে, মেথর ঝাড়ু দিতে আসিয়া উহা কুড়াইয়া পাইবে, এবং ভিতরে কি আছে দেখিবার জন্য গোপনে বাড়ী লইয়া যাইবে। টাকা কড়ি যদি কিছু থাকে তবে তাহা অপহরণ করিবে; কাগজপত্র যাহা আছে, যথার্থ অধিকারীর কাছে সেগুলি যতই দরকারী হউক, ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবে অথবা পোড়াইয়া ফেলিবে। আহা, যে বেচারী ইহা ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি যদি ইহা খুলি, তবে খুব সম্ভব প্রকৃত অধিকারীর নাম ধামের সন্ধান পাইব—যাহার জিনিষ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিব। সুতরাং খুলিয়া দেখাই উচিত হইতেছে।

পকেট হইতে আর একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া,

হেমন্তবাবু দপ্তরের দড়ি খুলিতে লাগিলেন। বস্ত্রাবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, আদালতের নীলাম ইস্তাহারী বৃহৎ মোটা ফরমে পুলিন্দাটি জড়ানো এবং আবার দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহা খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন নোট—কেবল নোট—সমস্তই নোট, অন্য কাগজপত্র কিছুই নাই। নোটগুলি থাকবন্দি করিয়া সাজানো, এইরূপ দশটি থাক, প্রত্যেকখানি নোট ১০০৲ টাকার করিয়া। দেখিয়া হেমন্তবাবুর মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। ভয় হইল এখনই হয়ত অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। নোটগুলি সেই অবস্থায় বেঞ্চির উপর ফেলিয়া, হেমন্তবাবু টলিতে টলিতে আবার গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং জলের নল খুলিয়া পাগলের মত মাথায় জল দিতে লাগিলেন। কলার ভিজিল, চাপকান ভিজিল, কতক জল কামিজের ফাঁকে প্রবেশ লাভ করিয়া পৃষ্ঠে গিয়া পৌঁছিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ জলসেকের পর নল বন্ধ করিয়া হেমন্তবাবু রুমালে মাথা মুখ মুছিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র রুমাল ভিজিয়া যায়, জল গালিয়া ফেলিয়া, আবার হেমন্তবাবু মাথা মুছেন। আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলেন, চক্ষু দুইটি লাল, টক্‌টক্ করিতেছে. চুলের টেড়ি বিলুপ্ত হইয়া মাথাটি অসভ্য বন্যজাতির মত হইয়াছে। অঙ্গুলি সাহায্যে চুলগুলি যথাসম্ভব ঠিক করিয়া লইয়া হেমন্ত বাবু স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। নোটের একটি থাক গণনা করিয়া দেখিলেন একশো খানি আছে, দশহাজার টাকা। অন্য থাক গুলিও সমান মোটা। দশটি থাক—লক্ষ টাকা।

নোটগুলি সেই নীলাম ইস্তাহারি কাগজে জড়াইয়া হেমন্ত নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরিলেন। ময়লা মোটা কাপড়খানা জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

ট্রেণ যথা সময়ে বর্দ্ধমানে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমন্ত বাবু নামিয়া, ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ প্রায় একমাস কাল পরে হেমন্ত বাবু রোগশয্যা ত্যাগ করিলেন, পথ্য পাইলেন। হুগলি হইতে ফিরিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া সেই রাত্রেই তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, প্রবল জ্বরে কয়েক দিন তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন। দিন পনেরো ষোল অবস্থা খুবই খারাপ গিয়াছিল। যমে মানুষে টানাটানি বলিলেই হয়। তাহার পর হইতে একটু সুরাহা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার—মায় সিভিল সার্জ্জন "সাহেব" পর্য্যন্ত—আসিয়াছিলেন। বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে—তা যাউক, প্রাণটা যে বাঁচিয়াছে ইহাই পরম ভাগ্য বলিতে হইবে।

শিঙি মাছের ঝোল সহ পুরাতন চাউলের চারিটি ভাত খাইয়া হেমন্তবাবু বিছানায় উঠিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া পাণ চিবাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার জননী আসিয়া বলিলেন, "বাবা, এতদিন তোমায় বলি নি, এই অসুখে আমার হাতে পুঁজিপাটা যা ছিল, তা সমস্তই প্রায় খরচ হয়ে গেছে। এখন দিন চলবে কি করে'

আমি সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে পড়েছি। কি যে হবে আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে।"—বলিয়া তিনি মুখখানি গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

. "গায়ে একটু বল পেলেই আদালতে বেরুই আবার।"—বলিয়া হেমন্তবাবু ঘরের কোণে আলমারিটির পানে চাহিলেন। হুগলি হইতে সেদিন বাড়ী আসিয়াই ব্যাগটা আলমারির ভিতর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে একটু জ্ঞান হইলেই, স্ত্রীর দ্বারা আলমারি খোলাইয়া ব্যাগটি বাহির করাইয়াছিলেন, এবং স্ত্রী কার্য্যান্তরে গেলে সেটি খুলিয়া দেখিয়াছিলেন, পুলিন্দাটি যেমন ছিল তেমনই আছে। এ কয়দিন শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিয়াছেন, যাহার টাকা, সে নিশ্চয়ই দুই একদিন পরে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে, সে বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাইলে পুরস্কারের টাকাটা পাইবার উপায় হয়। কিন্তু বাড়ীতে খবরের কাগজ নাই, পাড়ার বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে এতদিনের পুরাতন কাগজ এখন খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। উকীল লাইব্রেরীতে বড় বড় তিন খানি দৈনিক কাগজের ফাইল আছে, যথাসম্ভব শীঘ্র লাইব্রেরীতে গিয়া সেগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার প্রলোভনও তাঁহার মনের মধ্যে বিষম উৎপাত করিয়াছে—১০০৲ টাকার নোটের নম্বর রাখা হয় না, ধরা পড়িবার তেমন আশঙ্কাও নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হেমন্তবাবু সে প্রলোভনকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভাবিয়াছেন ছি ছি, পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, এত লেখাপড়া শিখিয়া, শেষে কি চোর হইব?

তবে পুরস্কারের টাকাটা লইতে হইবে বৈ কি! সেই বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের টাকাটার পরিমাণ কি হইতে পারে, ইহাই শুইয়া শুইয়া এ কয়দিন তিনি চিন্তা করিয়াছেন। যদি কোনও বিজ্ঞাপন না-ই বাহির হইয়া থাকে, তবে টাকা সম্বন্ধে কি করা উচিত, পুলিন্দা কুড়াইয়া পাওয়া সম্বন্ধে কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য হইবে কি না, ইহাও তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু মস্তিষ্ক এখনও দুর্ব্বল, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

অন্ন পথ্য পাইবার চার দিন পরে আদালতে যাইবার জন্য হেমন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মা আসিয়া নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "এখন এই দুর্ব্বল শরীর, হয় ত মাথা ঘুরে পড়ে' যাবে; নাই বা কাছারি গেলে বাবা! আরও দু'চার দিন যাক্, শরীরে একটু বল পাও, তারপর বেরিও।" স্ত্রী কমলিনী আসিয়া অনেক মিনতি করিলেন। হেমন্ত অনেক করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া, অভয় দিয়া, কাছারি যাত্রা করিলেন।

উকীল লাইব্রেরীতে পৌছিলে তাঁহার বন্ধু বান্ধব তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আরোগ্য লাভের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু ফাঁক পাইয়া, হেমন্ত লাইব্রেরী ঘরে গিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া, খবরের কাগজ গুলির ফাইলের নিকট বসিলেন। যে তারিখে হুগলি হইতে ফিরিয়াছিলেন, সেই তারিখ হইতে ৮।১০ দিনের কাগজের বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলি তন্ন তন্ন করিয়া এক ঘণ্টা কাল খুঁজিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞাপন

দেখিতে পাইলেন না। এই পরিশ্রমে তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীরটা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। মুখে কাণে জল দিয়া, এক গেলাস জল পান করিয়া, গাড়ী ডাকাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত নিৰ্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া রহিলেন।

হেমন্তের স্ত্রী আসিয়া কাছে বসিয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিল, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, এইরূপ ঘণ্টাখানেক শুশ্রূষার পর সে কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।

কয়েকদিন পরে পুনরায় কাছারি গিয়া পুলিস গেজেটের ফাইল, কলিকাতা গেজেটের ফাইল,অনুসন্ধান করিলেন,কিন্তু কোনও সন্ধান মিলিল না। টাকা হারাণোর কোনরূপ বিজ্ঞাপন কেহ দেয় নাই। মাসখানেক পরে হেমন্ত কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঘুরিলেন, কারেন্সি আপিস, রয়াল এক্সচেঞ্জের নোটিস বোর্ডগুলি খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও কোনরূপ সূত্র পাইলেন না।

অবশেষে নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া একখানি প্রধান ইংরাজি সংবাদ পত্রে এই মর্ম্মে সে বিজ্ঞাপন দিলেন—"রেলগাড়ীতে ভ্রমণ কালে আমি একটি পুলিন্দা কুড়াইয়া পাইয়াছি। হারাইবার তারিখ, স্থান, পুলিন্দায় কি ছিল ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা সহ আবেদন করুন।"—ইত্যাদি।

উপর্য্যুপরি ছয়দিন ধরিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, কিন্তু একখানি পত্রও হেমন্তের নিকট আসিল না।

তখন তিনি এ বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া একদিন তাঁহার জননীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জানাইয়া, টাকাটা

এখন কি করা উচিত সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মা সমস্ত শুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "অতগুলি টাকার লোভ, তুমি যে বাবা সংবরণ করতে পেরেছ, তাতে আমি বড় সুখী হয়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলের উপযুক্ত কাযই তুমি করেছ। এত করেও যখন টাকার মালিকের সন্ধান তুমি পেলেনা, তখন একটা কায কর। টাকাগুলি কলকাতায় কোনও ভাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে এস। ব্যাঙ্ক থেকে ঐ টাকার সুদ যা পাওয়া যাবে, তা তুমি স্বচ্ছন্দে নিজে ভোগ করতে পার, তাতে কোনও দোষ নেই, আমি তোমায় অনুমতি দিচ্চি। যদি ভবিষ্যতে কোনও দিন টাকার যথার্থ মালিক এসে উপস্থিত হয়, ঐ সমস্ত টাকাটা তাকে তুমি ফিরিয়ে দিও।"

হেমন্ত জননীর আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিলেন। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় গিয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্কে টাকাটা গচ্ছিত রাখিয়া আসিলেন।

ছয় মাস অন্তর ২৫০০৲ টাকা সুদ আসিতে লাগিল। সেই টাকায় এবং নিজের উপার্জ্জনে হেমন্ত স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল; ক্রমে ওকালতীতে হেমন্তের পশার জমিয়া গেল; আরও কয়েকটি নাতি নাতিনীর মুখ দেখিয়া তাঁহার জননী স্বর্গারোহণ করিলেন; বড় মেয়েগুলির বিবাহ হইল; বড় ছেলেরা পাশ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিল; হেমন্তের

দেহখানি স্থূল হইল, মস্তকের অগ্রভাগে টাক পড়িল; পৈতৃক বাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া তিনি নূতন ইমারৎ প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু ব্যাঙ্কে জমা সেই লক্ষ টাকার দাবীদার কেহ উপস্থিত হইল না; কিংবা তাহাকে আবিষ্কার করিবার কোন সূত্রও হেমন্ত পাইলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার। বেলা ৭টার সময়, অন্তঃপুরে বসিয়া হেমন্ত বাবু চা-পান করিতেছিলেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, আপিসঘরে একটি বাবু দেখা করিবার জন্য অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মক্কেল?" ভৃত্য বলিল, "বগলে ত কাগজ পত্র কিছু দেখ্‌লাম না।"—"আচ্ছা, বস্‌তে বল্"—বলিয়া হেমন্ত বাবু চা-পানে রত হইলেন।

চা-পানান্তে কিয়ৎকাল তামাকু-সেবন করিয়া, হেলিতে দুলিতে মন্থরপদে তিনি আপিসঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এক জন খর্ব্বকায় প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিলেন, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুগ্মকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃ-প্রণাম।" হেমন্ত বাবু আশীর্ব্বাদ-সূচক হস্তসঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "দেওয়ানজী, কলকাতা থেকে কবে এলেন? বাবু ভাল আছেন ত? বসুন বসুন।"

উভয়ে উপবেশন করিলে আগন্তুক বাবুটি বলিলেন, "আজ্ঞে, আজ ভোরের ট্রেণেই এসে পৌছেছি। আবার আজই ফিরে যেতে হবে। বাবুজী একটা বিশেষ কাযে আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

হেমন্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "স্বয়ং দেওয়ানজীকে পাঠিয়েছেন, কাযটা তা হলে গুরুতর বলুন!"

লোকটির নাম হরিহর দত্ত,—ইঁহার মনিব শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এই জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামের জমিদার। আসলে ইঁহারা জমিদার নহেন, বর্দ্ধমান রাজ-এষ্টেটের পত্তনীদার—কিন্তু লোকে জমিদারই বলিয়া থাকে। আজ প্রায় বিশ বৎসর হইতে ইন্দ্রবাবু কলিকাতায় গৃহনির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে জমিদারীতে আসা প্রায়ই ঘটে না।

হেমন্ত বাবু ইঁহার এষ্টেটের বাঁধা উকীল। শুধু উকীল নহেন, —বন্ধু। বাল্যকালে উভয়ে যখন একত্রে স্কুলে পড়িতেন, সেই সময় হইতেই দুই জনে অকৃত্রিম প্রণয়। যৌবনেও সেই বান্ধবতা অব্যাহত ছিল। ওকালতীর প্রথম অবস্থায়, সেই দুঃখের দিনে, হেমন্ত কতবার ইন্দ্রবাবুর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন। তাহার পর ইন্দ্রবাবু কলিকাতাবাসী হইলেন। তখন হইতে দেখা-সাক্ষাৎ কমিল। হেমন্ত বাবু এখনও কলিকাতা গেলে, মামলা-মোকর্দ্দমা-সংক্রান্ত কোনও পরামর্শ না থাকিলেও, ইন্দ্রবাবুর বাটীতে গিয়া মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা যাপন করিয়া থাকেন।

দেওয়ানজী বলিলে, "আপনি ত জানেনই, দেনাপত্রে আমরা

এদানী বড়ই জড়ীভূত হয়ে পড়েছি। বাবুজী এতদিন খরচপত্র খুব দরাজ হাতেই করে এসেছেন। এষ্টেটের যা আয়, তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ করতেন। টাকাকে টাকা জ্ঞান করতেন না। আমি মাঝে মাঝে বুঝিয়েছি, কিন্তু চাকর মনিব সম্বন্ধ, বেশী কিছু বল্‌তেও পার্‌তাম না। ফলে—যা হবার তাই হয়েছে। মেরে কেটে বড় জোর লাখ দেড়েক টাকা ত আয়; তাতে আর কত সয় বলুন! দেনার জ্বালায়, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হবার যোগাড়। কিন্তু এইটুকু সুখের বিষয় যে, এত দিনে বাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে। খরচপত্র একদম কমিয়ে দিয়েছেন। বাড়ীতে 'সাহেব' ভোজন বন্ধ হয়েছে; তিনখানা মোটর গাড়ী ছিল, তার দু'খানা বেচে ফেলেছেন; বাড়ীতে রাণীমা'র, কুমারদের আটপৌরে ব্যবহারের জন্যে এখন মিলের কাপড় কেনা হচ্চে,—অধিক আর কি বল্‌বো,—নিজে এখন O. H. M. S. খাচ্চেন!"

শুনিয়া, হেমন্ত বাবুর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "এ সব ত গেল ভূমিকা। আসল কথাটা কি?"

দত্তমহাশয় বলিলেন, "বল্‌ছি। আসল কথার জন্যেই ত এসেছি। পাওনাদারেরা যোট বেঁধে এখন নালিশ করা সুরু করেছে। তিনটে ডিগ্রী হয়ে গেছে—এখনও টাকা দাখিল কর্‌তে পারা যায় নি। আরও গোটা চার পাঁচ মামলা ঝুলছে। এরা সব দোকানদার—বেশীর ভাগই 'সাহেব' দোকানদার। কিছু হ্যাণ্ডনোটও আছে—কেউ কেউ উকীলের চিঠিও দিয়েছে। কিছুদিন হ'ল, এক জন ত বাড়ী বয়ে এসে, চাকরবাকর কর্ম্মচারীদের সাম্‌নেই বাবুজীকে

অপমান করে গেছে। সেই দিন বাবুজী প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'এক শালার এক পয়সাও আর বাকী রাখ্‌বো না—সমস্ত মিটিয়ে দেব—তাতে যদি আমার সমস্ত এষ্টেট বিক্রী করতে হয়, সো ভি আচ্ছা'।"

হেমন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেনার পরিমাণ সবশুদ্ধ কত হবে?"

"আমরা হিসেবে করে দেখেছি, এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা হলেই সমস্ত দেনা মিটে যায়—কারুর এক পয়সাও আর বাকী থাকে না। সেই টাকাটার এখন প্রয়োজন। টাকাটা তোল্‌বার জন্যে, বাবুজী স্থির করেছেন, তাঁর জমিদারীর দুই একটা মহাল বিক্রী করে ফেল্‌বেন।"

হেমন্ত বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "একেবারে বিক্রী করে ফেল্‌বেন? তার চেয়ে বন্ধক রেখে—"

"আমরাও সেই পরামর্শই বাবুজীকে দিয়েছিলাম। আগে আগে কোনও পাওনাদার এ রকম নালিশ টালিশ করে ব্যতিব্যস্ত কর্‌লে, আমরা অন্য কোথাও থেকে টাকাটা ধার করে এনে সেটা মেটাতাম। কিন্তু বাবুজী সে দিন ঐ রকম অপমানিত হওয়ার পর, পৈতে ছুঁয়ে শপথ করেছেন, ধার আর তিনি কর্‌বেন না—তাতে যদি ছেলেপিলে নিয়ে উপবাস কর্‌তে হয়, সো ভি আচ্ছা। সুতরাং, কিছু সম্পত্তি বিক্রী করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

হেমন্ত বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে বলিলেন, "খদ্দের কেউ ঠিক হয়েছে?"

"আজ্ঞে না। কল্‌কাতার ধনীরা, পাড়াগাঁয়ের জমিদারী বড় কিন্‌তে চায় না। চাইলেও, দর অসম্ভব কম বলে। বাবুজী এই কাযটির জন্যে আপনার উপরেই ভার দিতে চান। এ জেলায় আপনার ত অনেক বড় বড় মক্কেল আছে—কোথাও যদি—"

হেমন্ত বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "খদ্দের—অবশ্য—আমি ঠিক করে দিতে পারি। কিন্তু, এটা যে বড়ই দুঃখের বিষয় হ'ল দেওয়ানজী!"

দেওয়ানজী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে সে ত বটেই! কিন্তু উপায় কি? বছরে সাত আট হাজার টাকা—হয় ত আরও বেশী—আয় কমে যাবে। কিন্তু আবার এও ভাবি, শরীরের যে অঙ্গে দুষ্ট ক্ষত হয়েছে, সে অঙ্গটা কেটে ফেলে, বাকী দেহটা যদি সুস্থ নিরাময় হয়, প্রাণটা যদি বাঁচে,—তবে সেই কি একটা কম লাভ? দুই একটা মহাল গিয়ে বাকী সম্পত্তিটি যদি বজায় থাক্‌বার উপায় হয়—এই ঘটনা থেকে বাবুজী যদি স্থায়ীভাবে নিজেকে সংশোধন করতে পারেন,—তা'লে দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই।"

হেমন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কোন্ মহাল বিক্রী হবে, কিছু স্থির হয়েছে কি?"

"না, স্থির এখনও কিছু হয় নি। যে কিন্‌বে, তার সুবিধার উপর কতকটা নির্ভর কর্‌ছে ত! এই একটা লিষ্টি আমি এনেছি।"—বলিয়া দেওয়ানজী তাঁহার পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উকীল বাবুর হাতে দিলেন। অতঃপর

দুই জনে মহালগুলির সম্ভাবিত মূল্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

বেলা দশটা বাজিলে দেওয়ানজী উঠিলেন। হেমন্তবাবু তাঁহাকে সান্ধ্যভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে হেমন্ত বাবুর গাড়ী তাঁহাকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবে; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, আপিস-কক্ষে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে জন দুই মক্কেল বিদায় করিয়া, রবিবাসরিক দিবানিদ্রার জন্য হেমন্ত বাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে টেবলের উপরকার বহি কাগজগুলা সাজাইয়া রাখিতেছেন। কমলিনী এখন আর সেই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার ক্ষীণকায়া যুবতী নাই। অবয়বে প্রৌঢ়া জননীর লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। দেহখানি, বড় উকীলের গৃহিণীর যেরূপ স্থূল হওয়া উচিত, সেইরূপই হইয়াছে। হেমন্ত বাবু পালঙ্কে বসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার খাওয়া হল?”

“হ্যাঁ, এই কতকক্ষণ খেয়ে উঠলাম”—বলিয়া গৃহিণী স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, “বস তবে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্।”

আদালত খোলা থাকিলে, পশারওয়ালা উকলীগণের পত্নীরা, ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন ভিন্ন স্বামীর সহিত বিশ্রম্ভালাপের আর বড় সুযোগ পান না। প্রাতে কাক ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপিসগৃহে মক্কেলের আবির্ভাব ; বেলা দশটা বাজিলে অন্দরে আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া বাবুর আদালত-যাত্রা ; আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ জলযোগের পর আবার মক্কেলের উপদ্রব, তাহাদের 'বয়ান' শুনিতে শুনিতে ও কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে বাবুর রাত্রি দশটা বাজিয়া যায়—এগারোটাও বাজে ; তাহার পর অন্তঃপুরে আসিয়া ঠাণ্ডা লুচি ভোজনের পর শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে শয্যালিঙ্গন—দাম্পত্য আলাপের একান্ত সময়াভাব।

পুত্র, কন্যা, জামাতা প্রভৃতির প্রসঙ্গ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার পর গৃহিণী বলিলেন, "আজ সকালে নরেন্দ্রপুরের দেওয়ান এসেছিল, ওঁদের জমিদারী নাকি কিছু বিক্রী হবে?"

"হ্যাঁ। তুমি কোথায় শুন্‌লে?"

গৃহিণী একটু হাসিয়া, মাকড়ি দুলাইয়া বলিলেন, "আমার কি চর নেই? ঘরে বসে বসেই আমি অনেক খবর রাখি গো! কত টাকায় বিক্রী হবে?"

"লাখ টাকার উপর। এক লাখ বিশ হাজারের কম নয়। কেন, কিন্‌বে না কি? কেনো ত কওলা মুসাবিদা বাবদ আমার ফীজের টাকা এই বেলা বায়না দাও।"—বলিয়া হেমন্ত হাসিলেন।

গৃহিণী এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, নির্জ্জন দেখিয়া, 'এই নাও' বলিয়া একটি পাণ স্বামীর মুখে গুঁজিয়া দিলেন।

দাম্পত্য-লীলা শেষ হইলে গৃহিণী বলিলেন, "দেখ, ঐ জমিদারীর আমাদের কিছু কিনে নিলে হয় না? আমার অনেক দিনের সাধ, কিছু জমিদারী সম্পত্তি আমাদের হয়। ছেলেরা বড় হয়ে উঠলো, ওরা বেঁচে থাক্, সকলেই যে বেশী লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে পারবে, এমন ভরসা কি? কিছু ভূসম্পত্তি থাকলে খাওয়া-পরার ভাবনাটা থাকবে না।"

হেমন্ত গড়গড়ার নল মুখ হইতে খুলিয়া বলিলেন, "সে ত সব বুঝি। কিন্তু অত টাকা কোথা পাব? এতদিন যা রোজগার করলাম, মেয়েদের বিয়ে দিতে আর এই বাড়ীখানি করতেই ত গেল! খানকতক কাগজ যা আছে, তাতে কি আর জমিদারী খরিদ হয়?"—বলিয়া হেমন্ত বাবু গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "কেন, ব্যাঙ্কে আমাদের যে লাখ টাকা জমা রয়েছে, সেই টাকা, আর ঘরে যে কাগজ আছে, তাতে ত হয়ে যায়।"

হেমন্ত স্ত্রীর মুখ পানে চাহিলেন।

কমলিনী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "দেখ, ও টাকা ভগবান্ তোমাকে দিয়েছেন, ও তোমারই টাকা। নইলে আজ পচিশ বচ্ছর কেউ কি তার খোঁজ করত না? ও টাকা স্বচ্ছন্দে তুমি নিজের ব'লে মনে করতে পার, তাতে কিচ্ছু অন্যায় হবে না।"

হেমন্ত বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু—মা যে ব'লে গেছেন, ও টাকা রেখে দিতে,—যার টাকা, সে যদি কোনও কালে উপস্থিত হয় তাকে দিতে।"

গৃহিণী বলিলেন, "মা বলেছিলেন, তাঁর আজ্ঞা পঁচিশ বছর তুমি ত পালন করলে! যখের ধন ত নয় যে, চিরজীবন ঐ টাকা তোমায় আগ্‌লে ব'সে থাকতে হবে?"

হেমন্ত বাবু নীরবে গড়্‌গড়া টানিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "কিন্তু ধর, কেউ যদি এসে টাকাটা দাবী করে?"

গৃহিণী বলিলেন, "শুধু দাবী করলেই ত হবে না। ভাল রকম প্রমাণ ত চাই। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আইনকানুনের কিছুই বুঝিনে, কিন্তু তোমাদের মুখেই ত শুনি যে, দিন যত যায়, কোন বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া ততই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এক আধ বচ্ছর নয়, পঁচিশ পঁচিশ বচ্ছর কেটে গেছে!"

"তা ঠিক।"—বলিয়া হেমন্ত গড়্‌গড়ার নল ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গৃহিণী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে, হেমন্ত মুদিত-নয়নে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! এক লক্ষ টাকা যার হারিয়ে গেল, পঁচিশ বৎসরকাল সে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না!—এ রকম আশ্চর্য্য ঘটনা আমি ত কখনও শুনিও নি।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কি? তুমি এখনও ঘুমোও নি বুঝি? আমি ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছ।"

হেমন্ত উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ঘুমের পথ কি আর তুমি রেখেছ, গিন্নি?"

"কেন, আমি কি করলাম?"

"মাথায় প্রলোভনের আগুন জ্বেলে দিয়েছ যে!"

গৃহিণী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "অন্যায় ত আমি কিছু বলিনি। আমার কি দোষ?"

হেমন্ত হাসিয়া বলিলেন, "তোমার দোষ কিছু না। বাইবেলের গল্প শোন নি? সর্পরূপী শয়তান ইডেন্ বাগানে এসে, বহু কষ্টে মানব-মাতা ঈভ কে নিষিদ্ধ ফলটি খাইয়েছিল। তার পর ঈভ্ কিন্তু অতি সহজেই, আদমকে সেই ফল খেতে রাজী করেছিলেন। সেই ঈভের বংশেই তোমার জন্ম ত!"

গৃহিণী বলিলেন, "পোড়া কপাল আর কি! আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ঈভের বংশে আমার জন্ম হতে যা'বে কেন? তুমি শোও, ঘুমোও।"

হেমন্ত বলিলেন, "সে হবে এখন; লোহার সিন্ধুক খুলে ব্যাঙ্কের বইখানা বের করে আন ত।"

গৃহিণী বই আনিয়া দিলেন। হেমন্ত বাবু চশমা চোখে দিয়া দেখিলেন, কয়েকদিন হইল, সেই লক্ষ টাকার শেষ ডিপজিটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে; পুনরায় ডিপজিটের পত্র লেখা হয় নাই—অর্থাৎ টাকাটা যেদিন খুসী তুলিয়া লওয়া যায়।

ব্যাঙ্কের বহি সিন্ধুকে ফেরৎ পাঠাইয়া হেমন্ত বাবু আবার শয়ন করিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল না, বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "কি করি? দারিদ্র্যের অবস্থায় যে প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করতে

পেরেছিলাম, এখন স্বচ্ছলতার দিনে সেই প্রলোভনের হাতে আত্ম-সমর্পণ করব কি ?”

এইরূপ নানা চিন্তায় বেলা তিনটা অবধি কাটিল। হেমন্ত বাবু তখন উঠিয়া, আপিস-কক্ষে গিয়া দেওয়ানজী-প্রদত্ত সেই বিক্রেয় গ্রামগুলির তালিকাখানি দেরাজ হইতে বাহির করিলেন। প্রত্যেক গ্রামের হস্তবুদ জমা, আঞ্জামী খরচা, বর্দ্ধমানরাজকে দেয় বাৎসরিক খাজনা, মুনাফা প্রভৃতি তাহাতে লেখা আছে। বর্দ্ধমান জেলার সার্ভে ম্যাপ দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল, তিনি তাহাতে বিভিন্ন গ্রাম-গুলির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাকালে দেওয়ানজী পুনরাগত হইলে, হেমন্ত বাবু তাঁহাকে বলিলেন, “দেখুন, খদ্দের আর কোথায় খুঁজে বেড়াব? আমি নিজেই কিনে নেবো মনে করছি। (তালিকা বাহির করিয়া) এই বাঁশডাঙ্গা আর খাসবেড়িয়া গ্রাম দুখানি লাগাও আছে—এই দুখানি, যদি এক লাখ বিশ হাজারে আপনারা দেন ত আমি কিনে নিতে রাজী আছি।”

এত শীঘ্র খরিদ্দার স্থির হইবে, দেওয়ানজী তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একটু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, “সব টাকাটা—কিন্তু নগদ চাই। কেন না—”

হেমন্ত বাবু বলিলেন, “সে জন্যে চিন্তা নেই। সব টাকাটা এক সঙ্গেই দেবো।”

দেওয়ানজী বিস্মিত-নয়নে হেমন্ত বাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রথম প্রথম সেই দুই টাকা ফীজের অবস্থা হইতেই উকীল বাবুকে

তিনি দেখিয়া আসিতেছেন ; বৎসরের পর বৎসর অল্পে অল্পে কেমন করিয়া পশার বাড়িয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানেন ; কিন্তু এক সঙ্গে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা যে ইঁহার হইয়াছে, এটা দেওয়ানজীর জানা ছিল না।

পক্ষকাল পরে গৃহিণীর আশা পূর্ণ হইল। হেমন্ত বাবু জমিদার হইলেন—বাঁশডাঙ্গা ও খাসবেড়িয়া গ্রামদ্বয়ের মালিক হইলেন। এই উভয় গ্রামে অনেক ঘর গোয়ালার বাস। অল্প মূল্যে খাঁটি গব্যঘৃত, ক্ষীর, ছানা, দধি সেখান হইতে আসিতে লাগিল—গৃহিণীর স্থূলদেহ স্থূলতর হইয়া উঠিল।

আরও পাচ বৎসর কাটিয়াছে। এক দিন প্রাতে হেমন্ত বাবু হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইলেন, কলিকাতায় তাঁহার বন্ধু ও মক্কেল ইন্দ্রভূষণ বাবু মৃত্যুশয্যায় শায়িত ; হেমন্ত বাবুর সহিত তিনি অন্তিম-সাক্ষাৎ কামনা করেন।

হাতের মোকর্দ্দমাগুলির কাগজপত্র জুনিয়র উকীল বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া, আহারান্তে সেই দিনই হেমন্ত বাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘকাল অত্যাচারের ফলে, ইন্দ্রভূষণবাবু কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সহরের বড় বড় "সাহেব" ডাক্তার, বাঙ্গালী

ডাক্তার, কবিরাজ আজ মাসাধিককাল চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই একটু সুহারা হয় নাই, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন, অন্য সকলেই তাঁহার বাঁচিবার আশা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিল ;— গত কল্য ডাক্তারেরাও জবাব দিয়াছেন। অনেক সময় ইন্দ্রবাবু সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই থাকেন, মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টার জন্য জ্ঞান হয় মাত্র। গত কল্য অপরাহ্ণকালে এইরূপ অবস্থায়, হেমন্তবাবুর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ তিনি দেওয়ানজীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে বর্দ্ধমানে তাঁহাকে তার করা হইয়াছিল।

বেলা পাঁচটার সময় হেমন্তবাবুর গাড়ী আসিয়া ইন্দ্রবাবুর ফটকের কাছে দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, নিম্নতলেই দেওয়ানজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেওয়ানজী সজলনয়নে তাঁহার প্রভুর অবস্থা সমস্তই হেমন্তবাবুকে জানাইলেন। হেমন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে দাদা এত ব্যাকুল হয়েছেন কেন, তা কিছু আপনি শুনেছেন? কোনও বিশেষ কারণ আছে কি?"

দেওয়ানজী বলিলেন, "আপনি তাঁর বাল্যকালের বন্ধু, সেই জন্যেই বোধ হয়। তা ছাড়া কোনও কারণ যদি থাকে, সেটা আমি জান্‌তে পারি নি।"

দেওয়ানজী হেমন্তবাবুর মুখাদি ধাবনের বন্দোবস্ত করিয়া

দিয়া তাঁহার আগমনসংবাদ দিবার জন্য উপরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনার চা দেওয়া হয়েছে, উপরে চলুন।"

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কি জেগেছেন?"

"না"—বলিয়া দেওয়ানজী অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

একটি কক্ষে হেমন্তবাবুর জন্য জলযোগ সাজানো ছিল। তিনি জলযোগে বসিলেন। যুবা সুরেন্দ্রভূষণ, ইন্দ্রবাবুর একমাত্র পুত্র, "কাকাবাবু, ভাল আছেন ত?" বলিয়া কাছে আসিয়া বসিল; চিকিৎসা ও চিকিৎসকগণ সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিল।

জলযোগ শেষে হেমন্ত বলিলেন, "যাও দেখি বাবা, আর একবার দেখে এস জেগেছেন কি না।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না, বাবা এখনও জাগেন নি। মা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি ভিতরে আসুন।"

ইন্দ্রভূষণ দুই তিন বছরের বড় বলিয়া হেমন্ত তাঁহাকে দাদা ও তাঁহার স্ত্রীকে বউঠাকরুণ বলিতেন। পূর্ব্বকালে, যখন ইন্দ্রবাবু নূতন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, হেমন্ত কখনও কখনও আসিয়া দেবরের ন্যায় বধূঠাকুরাণীর উদ্দেশে হাস্য-পরিহাস, আমোদ-আব্দার করিতেন, তিনিও তাহার জবাব দিতেন,—কিন্তু অন্তরাল হইতে। সাক্ষাৎভাবে এ পর্য্যন্ত কখনও বাক্যালাপ হয় নাই। তাই হেমন্তবাবু অনুমান করিলেন, যে বিশেষ কারণ জন্য ইন্দ্রভূষণ

অন্তিম-শয্যায় তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, সম্ভবতঃ সেই প্রসঙ্গেই বউঠাকুরুণ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।

সুরেন্দ্র তাঁহাকে লইয়া গিয়া একটি ঘরে বসাইয়া, মাকে আনিতে গেল। ক্ষণকাল পরে অর্দ্ধাবগুন্ঠিতা এক জন প্রৌঢ়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। "বউঠারুণ ?" বলিয়া হেমন্ত তাঁকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার বিষাদখিন্ন স্ফীত অবনত চক্ষু দুইটির পানে চাহিলেন।

গৃহিণী মাথার কাপড় একটু তুলিয়া, পুত্রকে বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি ওঘরে গিয়ে ব'স।"

হেমন্ত সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিলেন। কি এমন কথা ইনি বলিবেন, যাহা উপযুক্ত পুত্রেরও অশ্রাব্য ? ইহাই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ।

সুরেন্দ্র চলিয়া গেলে গৃহিণী অশ্রুভরা কণ্ঠে কহিলেন, "ব'স ঠাকুরপো, ব'স।"

"আপনি বসুন" বলিয়া হেমন্ত চেয়ারখানিতে বসিলেন।

গৃহিণী বসিলেন না; তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হেমন্ত তাঁহার এই সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে কি বল্‌বেন, বউঠাকরুণ ?"

গৃহিণী সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "ঠাকুরপো, কর্ত্তা তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তা কিছু তুমি জান কি ?"

"না, আমি ত কিছু জানিনে। আপনি জানেন ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, আমি বিশেষ কিছু জানিনে। তবে

এইটুকুমাত্র তিনি আমায় বলেছেন, তোমার নাম করে' 'এক সময়ে আমি তার একটা ভয়ানক অনিষ্ট করেছি। সে আমাকে ক্ষমা না কর্‌লে, পরলোকে আমার সদ্‌গতি হবে না।' এইটুকু মাত্র তিনি আমায় বলেছেন, আর কিছুই বলেন নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দেন নি, চুপ ক'রে ছিলেন। হয় ত তাঁর মনে কষ্ট হচ্চে, এই ভেবে আমি আর পীড়াপীড়ি করি নি। খুব সম্ভব, সেই বিষয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার জন্যেই তিনি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। ঠাকুরপো, আমি ত আজ ত্রিশ বছর তোমাদের দেখছি, সব খবরই জানি; কিন্তু তিনি তোমার প্রতি কোনও দিন কোনও অন্যায় যে করেছেন, তা তো আমি জানিনে! কি অন্যায় তিনি করেছেন, যদি বল্‌তে কোনও বাধা না থাকে, তবে তুমি আমায় তা বল, ঠাকুরপো!"

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তিনি আমার প্রতি অন্যায় করেছেন? আমার অনিষ্ট করেছেন? কবে? কি অনিষ্ট করেছেন? কৈ, আমিও ত কিছু ভেবে পাচ্চিনে!"

গৃহিণী বলিলেন, "এ ত আশ্চর্য্য কথা। তিনি বলেন, তোমার তিনি ঘোর অনিষ্ট করেছেন, অথচ তুমি বল্‌ছ তুমি কিছুই জান না?"

"জ্বরের ঘোরে তিনি ভুল বকেছেন বোধ হয়!" বলিয়া হেমন্ত বাবু মুখ অবনত করিয়া রহিলেন।

গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব চিন্তা করিয়া, মুখখানি তুলিয়া,

অশ্রু-গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, "আজকে দু'তিন বার, যখনই ওঁর জ্ঞান হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করেছেন, 'হেমন্ত এসেছে?' আমরা বলেছি, তাঁকে 'তার' করা হয়েছে, আজ কোনও সময়ে তিনি এসে পৌঁছবেনই। এখন অঘোরে ঘুমুচ্চেন, আবার জ্ঞান হলেই তিনি তোমায় ডেকে পাঠাবেন। তোমায় তিনি কি বল্‌বেন, তা জানিনে,—তোমার কি ক্ষতি করার কথা বলে' তোমার কাছে মাপ চাইবেন, কিছুই আমি অনুমান করতে পারচিনে। তুমি নিজেই যখন এর বিন্দুবিসর্গ জান না, আমি কি ক'রে জানব? কিন্তু দোহাই তোমার ঠাকুরপো"—(গৃহিণী গলবস্ত্র হইয়া যোড় হাত করিলেন)—"তিনি তোমার প্রতি যে অন্যায় করার কথাই বলুন, যে ক্ষতি, যে অনিষ্ট করার কথাই বলুন, তুমি প্রসন্ন মনে তাঁকে ক্ষমা কোরো। নইলে, এই অন্তিম সময়ে—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

হেমন্ত বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি হাতযোড় করেন কেন, বঠাকুরুণ? করেন কি! আমায় অত ক'রে বল্‌তে হবে না। খুব সম্ভব জ্বরের ঘোরে একটা কোনও কাল্পনিক অনিষ্টের কথাই তাঁর মাথায় ঢুকেছে। যদি বাস্তবিকই কিছু হয়, আমি আপনার কাছে কথা দিচ্চি, আমি এমন ভাবে উত্তর করব, যাতে তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ, কোন অশান্তি আর না থাকে। আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন বউঠাকরুণ!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক ঘণ্টা পরে ইন্দ্রভূষণ বাবুর পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল। গৃহিণী যেরূপ বলিয়াছিলেন, জাগিয়াই তিনি হেমন্ত বাবুর খোঁজ করিলেন। হেমন্ত বাবু অনতিবিলম্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নীত হইলেন।

ইন্দ্রভূষণ ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "হেমন্ত, এসেছ ভাই? আমার মেয়াদ ত শেষ হয়ে এসেছে। তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে, সেইটি না বল্লে আমার প্রাণ বেরুচ্চে না। ওগো, তোমরা সবাই একবার ও ঘরে যাও।"

উপস্থিত সকলে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় গৃহিণী মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে হেমন্ত বাবুর পানে চাহিয়া গেলেন।

নির্জ্জন হইলে, ইন্দ্রভূষণ বাবু বলিলেন, "বেশী কথা কবার সময় নেই, শক্তিও নেই। হেমন্ত, মনে আছে, তোমার ওকালতীর সেই প্রথম অবস্থা? বড় কষ্টে তোমার দিন যাচ্ছিল।"

হেমন্ত বলিলেন, "হ্যাঁ দাদা, মনে পড়ে বৈকি! তোমার কাছে সে সব দিনে অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি; জীবনে তা কি ভুলবো?"

ইন্দ্রভূষণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাক্। তখন তিন বছর না চার বছর তোমার প্র্যাকটিস হয়েছে। জার্ম্মাণীতে যে লটারী খেলা হয়, আমি সেই লটারির দুখানি টিকিট কিনেছিলাম। একখানি তোমার জন্যে, একখানি আমার নিজের জন্যে। তোমার

আসল ঠিকানাটি না দিয়ে, আমার কেয়ারেই লিখে দিয়াছিলাম। উঃ, গলা শুকিয়ে যাচ্চে, একটু জল।"

হেমন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই কাহিনী শুনিলেন। তাঁহার মনে হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা ত জ্বরের প্রলাপের মত শুনাইতেছে না। পাশের টেবিলে জলের গেলাস ছিল। দুই তিন চামচ জল রোগীকে তিনি পান করাইয়া দিলেন।

জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া ইন্দ্রভূষণ বাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "উভয়ের অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্যে, টিকিট দুখানি কিনেছিলাম। কত দিন হ'ল, সে আজ বোধ হয় ত্রিশ বছরের কথা, নয়?—আজ ত্রিশ বছর পরে তোমায় জানাচ্চি, তোমার টিকিটখানি এক লক্ষ টাকা প্রাইজ পেয়েছিল।"

হেমন্ত অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ!"

ইন্দ্র বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"যখন চিঠি এল, তখন আমি দেশের বাড়ীতে। তোমার নামে, আমার কেয়ারে রেজেষ্ট্রী করা চিঠি, তার ভিতর তোমার নামে লক্ষ টাকার একখানি ক্রশ-করা চেক। কলকাতায় যে জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক আছে, সেই ব্যাঙ্কের উপর চেক। আমার টিকিটে শূন্য উঠলো, তোমার টিকিট লক্ষ টাকা প্রাইজ পেলে, দেখে আমার বুকের ভিতরটায় যেন আগুন জ্বলতে লাগলো। আমি যে এত ক্ষুদ্রমনা, তা আগে জানতাম না। বুকের সেই আগুন বুকে চেপে রেখে, ভাবলাম, তোমায় গিয়ে খবরটা দিই, চেকখানা তোমায় দিয়ে আসি। উঃ—আর একটু জল।"

হেমন্ত আবার তাঁহাকে জলপান করাইলেন। পানান্তে ইন্দু বাবু বলিতে লাগিলেন, "তার পর, শয়তান আমার স্কন্ধে এসে ভর কর্‌লে। ভাবলাম, আমিই আত্মসাৎ করবো। আমিই ত টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলাম, সুতরাং তোমার ও টাকায় কিসের অধিকার? এই কুযুক্তি শয়তানই আমার মাথায় এনে দিলে। কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ক্রশ-করা চেক, কোনও ব্যাঙ্কের মারফৎ ভিন্ন ভাঙ্গানো হবে না। চেকের পিঠে তোমার নামটি আমি জাল করলাম। কল্‌কাতায় গিয়ে, আমার ব্যাঙ্কে সেই চেক জমা দিয়ে, পরদিন লক্ষ টাকা বের ক'রে নিলাম। সেই সময় জয়রামপুরের বাবুদের একখানা খুব ভাল মহাল দেনার দায়ে বিক্রী হচ্ছিল, সে মহালটা কিনে নেবার জন্যেই টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে, বাড়ী আস্‌ছিলাম।

"আমি যে নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা, তা নয়—আমি যে এত লোভী, এমন শঠ, প্রবঞ্চক,—পূর্ব্বে আমি তা জান্‌তাম না। যা হোক, টাকাটা নিয়ে বাড়ী আসছিলাম—কিন্তু মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন যে! আর, অদৃষ্ট ব'লে একটা জিনিষ আছে,—সেটা ভুল্লেই বা চল্‌বে কেন? ঐ লক্ষ টাকা যদি আমার অদৃষ্টে থাক্‌তো, তা হ'লে আমার টিকিটেই ত উঠতে পার্‌তো! তা তো ওঠেনি। লক্ষ টাকার নোটের সেই বাণ্ডিল নিয়ে ট্রেণে বর্দ্ধমান যাচ্ছিলাম; সঙ্গে হুইস্কি ছিল; গাড়ীতে বসে ঢালছিলাম আর খাচ্ছিলাম। এক সময় বাথরুমে যাই। নোটের বাণ্ডিলটি র‍্যাকের উপর রেখে মুখ ধুচ্ছিলাম। এমন সময় গাড়ী শ্রীরামপুরে এসে দাঁড়ালো। সোড

ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি নেমে, আইস ভেণ্ডারকে সোডা আন্‌তে বল্‌তে গিয়েছিলাম—হঠাৎ ট্রেণ ছেড়ে গেল। লক্ষ টাকার নোটের বাণ্ডিল, গাড়ীতে গোসল-খানার সেই র‍্যাকেই পড়ে রইল। চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে ওঠবার জন্যে আমি ছুটলাম। ষ্টেশনের লোকেরা হাঁ হাঁ করে আমার পিছু পিছু ছুটে আমায় ধর্‌তে এল। টানাটানিতে আমি ধড়াস্‌ করে প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে গেলাম। একখানা ইট না পাথর কি ছিল, মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরমায়ু ছিল, তাই গাড়ী আর প্ল্যাটফরমের ফাঁকের মধ্যে পড়িনি। ষ্টেশনের লোক, অজ্ঞান অবস্থায় আমায় হাঁসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে আট দশ ঘণ্টা পরে আমার চৈতন্য হয়। পরদিন বাড়ী আসি।”

এই কাহিনী শুনিয়া হেমন্তের, বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্তই যেন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। মাথার দুই রগ আঙ্গুলে টিপিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—“তাই কি? তাই কি?”

ইন্দ্র বাবু বলিলেন, “হাঁসপাতালে জ্ঞান হতেই টাকার খোঁজ নেওয়ার কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাবলাম, তাতে ফল কি হবে? কেউ না কেউ সেটা পেয়েছে। সে কখনই দেবে না, বা স্বীকার করবে না। যদি এই নিয়ে এখন একটা গোলমাল বাধাই, তা হলে আমার জাল করাটি ধরা পড়ে যাবে, সকল ব্যাপার খবরের কাগজে উঠবে—কেলেঙ্কারির একশেষ! হয় ত আমায় জেলেও যেতে হবে। তাই চুপ করে গেলাম।

"এবার এই ব্যারামে পড়ে, প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, তোমায় আমি এই যে মহা ক্ষতিটি করেছি, এই যে প্রবঞ্চনাটি তোমায় করেছি, তার পাপ কি আমায় লাগবে না? তার প্রতিফল, পরলোকে গিয়ে কি আমায় নিতে হবে না? দিন যতই এগিয়ে আস্‌ছে, এই চিন্তা আমার মনে ততই প্রবল হয়েছে। তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি, ভাই! সে সময়, এই টাকা পেলে তোমার কষ্ট ঘুচে যেত। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এখন তোমার কোনও অভাব নেই। এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে তুমি সম্পত্তি কিনেছ। ত্রিশ বচ্ছর আগে, তোমার এই যে ক্ষতিটি আমি করেছি, আজ তুমি তার জন্য আমায় মাপ কর, ভাই! বল, আমায় ক্ষমা কর্‌লে!" ইন্দ্র বাবুর দুই চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হেমন্ত বাবু তাঁহার হাত দুইখানি নিজ হস্তে লইয়া বলিলেন, "দাদা, শান্ত হও, শান্ত হও। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, তুমি যে বলেছ, সেই কথাই ঠিক। সেই টাকা আমারই অদৃষ্টে ছিল, আমিই তা পেয়েছি।"

ইন্দ্র বাবু প্রায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমিই সে টাকা পেয়েছ? বল কি? কোথা পেলে? অসম্ভব।"

হেমন্ত তাঁহাকে শোয়াইয়া দিয়া বলিল, "দাদা, উত্তেজিত হোয়ো না। তোমার মনের সমস্ত ক্ষোভ, সব সন্তাপ দূর কর। তোমার দ্বারা আমার কোনও অনিষ্ট হয় নি। সেই লক্ষ টাকার বাণ্ডিল, সেই ট্রেণে আমিই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

ইন্দ্র বাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হেমন্তের মুখের পানে চাহিয়া

রহিলেন ; বলিলেন, "মৃত্যুকালে আমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে মিছে কথা বোলো না, ভাই। তুমি আমায় অকপটচিত্তে ক্ষমা করেছ, এইটুকু জান্‌তে পার্‌লেই আমার যথেষ্ট সান্ত্বনা।"

হেমন্ত বলিল, "না, দাদা, তোমায় ভোলাবার জন্যে আমি মিছে কথা বলি নি। তোমার দুখানি গ্রাম আমি যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দিয়ে কিন্‌লাম, সে টাকার মধ্যে লক্ষ টাকা সেই টাকা।"

কোথায়, কবে হেমন্ত বাবু বাণ্ডিল পাইয়াছিলেন, বাণ্ডিল কিরূপ ভাবে জড়ানো ছিল, কত কত টাকার নোট তাহাতে ছিল, সমস্তই ইন্দ্র বাবু খুঁটিয়া খুঁটিয়া হেমন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত কথার উত্তর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জয় গোপীনাথজি! তোমার অসীম দয়া। মহাপাপ থেকে তুমি আমায় রক্ষা কর্‌লে!" —বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে মুখখানি প্রসন্নভাব ধারণ করিল, দুই চোখের কোণ হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ইহার কিয়ৎপরে, ইন্দ্রবাবুর স্ত্রীর সহিত হেমন্ত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিলেন। পরামর্শ হইল, ছেলেকে বা অন্য কাহাকেও এই পুরাতন কলঙ্ককাহিনী জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

পরদিন প্রাতের ট্রেণে হেমন্তবাবু বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। দুইদিন পরে ইন্দ্র বাবুর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল।

শ্রাদ্ধের দিন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য হেমন্ত বাবু কলিকাতায় গেলেন। মুণ্ডিতমস্তক সুরেন্দ্রভূষণ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন

করিয়া, জলযোগান্তে আসিয়া হেমন্ত বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। হেমন্ত বাবু সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে নানা মিষ্ট বাক্য বলিয়া, অবশেষে পকেট হইতে একখানি বড় লেফাফা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবা এইটি আমার লৌকিকতাস্বরূপ তুমি গ্রহণ কর।"

"কি এ?"—বলিয়া সুরেন্দ্র খামখানি খুলিয়া ফেলিল। দেখিল, ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রী আপিসের মোহরযুক্ত একখানি দলিল। জমীদারের ছেলে, অল্পদূর পড়িয়াই বুঝিতে পারিল, ইহা একখানি দানপত্র,—চারিবৎসর পূর্ব্বে পিতার নিকট হইতে ক্রীত দুইখানি গ্রামের একখানি (বাঁশডাঙ্গা) পুত্রকে, পিতৃ-শ্রাদ্ধে লৌকিকতা-স্বরূপ হেমন্ত বাবু দান করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে হেমন্তবাবুর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি, কাকামহাশয়!—এ আপনি কি করেছেন? এর নাম কি লৌকিকতা দেওয়া? না না—এ আমি কোনমতেই নিতে পারিনে।"

হেমন্ত বাবু বলিলেন, "না, বাবা, তুমি মনে কোনও সঙ্কোচ কোরো না। যে টাকা দিয়ে তোমাদের ঐ গ্রাম দু'খানি আমি কিনেছিলাম, সে টাকার অধিকাংশই তোমার বাপের অনুগ্রহেই আমার পাওয়া—তোমার বাপের টাকাও বলা যেতে পারে এক হিসাবে। বাঁশডাঙ্গা আমি তোমায় দান করছিনে, ও ত তোমারই, তোমার বাবাই বরং খাসবেড়ে আমায় দান ক'রে গেছেন।"

সুরেন্দ্র ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া হেমন্ত বাবুর মুখের পানে চাহিয়া

রহিল ; শেষে বলিল, "আপনি কি বলছেন ?—এ যে প্রহেলিকার মত। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে কাকা মহাশয়।"

হেমন্ত বলিলেন, "এর মধ্যে অনেক কথা আছে, বাবা, সে সব তোমার শুনে কায নেই। তোমার মা সমস্তই জানেন। তুমি বিনা দ্বিধায় বাঁশডাঙ্গা গ্রামখানি ফিরিয়ে নাও। তাতে কোনও দোষ, কোনও অন্যায় হবে না।"

"আচ্ছা, মাকে তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি। তিনি যদি অনুমতি করেন ত নেবো।" বলিয়া সুরেন্দ্র চলিয়া গেল।

মাতা শুনিয়া অনুমতি দিলেন। সুরেন্দ্র আসিয়া হেমন্তবাবুকে তাহা জানাইয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

জ্যোতিষী মহাশয়



১

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার কোনও ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর একটি কক্ষে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মুণ্ডিত-গুম্ফশ্মশ্রু প্রৌঢ়বয়স্ক কৃষ্ণকায় শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বসিয়া ধূমপান করিতে-ছিলেন। গৃহিণী ও কন্যারা নিম্নতলে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত, ছেলেরা ফুটবলের ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। জ্যোতিষী মহাশয় একাকী বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, আর আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছেন।

আজ প্রায় ২০ বৎসরকাল এই কলিকাতা সহরে তিনি জ্যোতিষ 'প্র্যাকটিস্' করিতেছেন, কিন্তু এমন দুর্ব্বৎসর কখনও হয় নাই। খবরের কাগজে তাঁহার বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে—সে সকল বিজ্ঞাপনের বিলের তাগাদায় তিনি অস্থির,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটি কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডারও আসিতেছে না। গরদ পরিয়া, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, তিনি তাঁহার দ্বারলগ্ন সাইন-বোর্ডের ঘোষণা অনুসারে প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া হত্যা দিতেছেন, কিন্তু একটি লোকও হাত গণাইতে আসিতেছে না। বাড়ীর ভাড়া, ভৃত্যের বেতন,

"বিজ্ঞাপনের বিলের অনেক টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে; প্রতি দিনকার বাজার-খরচ চলাই কঠিন, এ কি উপায় করিলে কিছু টাকা আসে, এই চিন্তাতে তিনি মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উত্থিত হইল—"জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন?"

শ্রবণমাত্র, হুঁকাটি দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সন্তর্পণে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়া, চিক ফাঁক করিয়া লোকটাকে দেখিলেন। বুঝিলেন, বাড়ীওয়ালার লোক নহে, বিজ্ঞাপনের বিল আদায়কারী দ্বারবানও নহে—মক্কেল হইলেও হইতে পারে। তখন নির্ভয়ে হাঁকিলেন—"কে ও?"

নিম্ন হইতে স্বর উত্থিত হইল, "জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন কি? তাঁর কাছে একটু দরকারে এসেছি।"

"আচ্ছা দাঁড়ান"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় চট্ করিয়া তাঁহার মিলের ধুতি ছাড়িয়া গরদ পরিলেন, চটি জুতা ছাড়িয়া খড়ম পায়ে দিলেন। আশান্বিত হৃদয়ে খট্ খট্ করিতে করিতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়া, সদর দরজা খুলিয়া তিনি প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তকের পানে চাহিলেন।

লোকটির বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর; পরিধানে ধুতির উপর আধময়লা চাপকান, তাহার উপর পাকানো চাদর বিন্যস্ত—আফিসের বেশ। তিনি বলিলেন, "একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"আসুন"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন। অয়েলক্লথ মোড়া একটি টেবিলের তিন দিকে তিন

খানি চেয়ার এবং এক দিকে একখানি বেঞ্চি। জ্যোতিষী মহাশয় একখানি চেয়ারে বসিয়া অপর একখানিতে আগন্তুককে বসাইলেন।

আগন্তুক, আসন গ্রহণ করিয়া, যেন বড় ক্লান্তস্বরে বলিলেন, "জ্যোতিষী মশায়, শারীরিক কুশল ত ?"

জ্যোতিষী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন। যাহারা গণাইতে আসে, তাহারা কেহ ত কৈ এরূপভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে না। যাহা হউক, তিনি শিরশ্চালনা ও একটা অস্ফুট ধ্বনির দ্বারা নিজ কুশল জ্ঞাপন করিলেন।

লোকটি অর্দ্ধমিনিটকাল নীরব থাকিয়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "তার পর—কায-কর্ম্ম চল্‌ছে কেমন ?"

এই প্রশ্নে জ্যোতিষী মহাশয়ের মনে একটু রাগ হইল। কেন রে বাপু ? তোর সে খোঁজে দরকার কি ? গণাইতে আসিয়া থাকিস্, তাই বল্, টাকা বাহির কর্। কিন্তু এই বিরক্তিভাব মনেই গোপন করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "চল্‌ছে মন্দ নয়। আপনার নামটি কি ?"

আগন্তুক বলিলেন, "আমার নাম ?—নামটা, আচ্ছা—সেটা পরে জানাব না হয়। এখন যে কাযের জন্য এসেছি, সেইটে প্রথমে নিবেদন করি।" বলিয়া চুপ করিলেন।

নিজ নাম বলিতে লোকটির এই অনিচ্ছা দেখিয়া জ্যোতিষী যেন একটু সন্দেহযুক্ত হইলেন। মুখে বলিলেন, "সেই ভাল।"

বাবুটি তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি বল্লেন, আপনার কায-কর্ম্ম মন্দ চল্‌ছে না। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, যতটা ভাল চলা উচিত, তা চল্‌ছে না। কেমন কি না?"

লোকটা যে গণাইতে আসে নাই, ইহা জ্যোতিষী মহাশয় এবার নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া, বড় রাগ হইল। তিনি আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "আঃ ও সব ভূমিকা যেতে দিন না, মশায়! কি জন্যে আপনি এসেছেন, সেইটে খোলসা ক'রে বলুন। সন্ধ্যে হয়ে এল, আমার পূজো-আহ্নিকের সময় ব'য়ে যাচ্ছে।"

বাবুটি এই মৃদু ভর্ৎসনাটুকু মোটেই গায়ে মাখিলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, যে ব্যবসাই বলুন, আজকাল যে রকম দিন-সময় পড়েছে, বিনা বিজ্ঞাপনে—"

জ্যোতিষী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কি কোনও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ক্যান্‌ভাসার? তা-হ'লে বৃথা আপনার সময় নষ্ট করবেন না। আমি দু'খানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। আর নূতন কোনও কাগজে—"বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

লোকটি শান্তভাবে বলিলেন, "আহা, চট্‌ছেন কেন? আমি বিজ্ঞাপন ক্যান্‌ভাসার নই। বসুন বসুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কি? ডিটেক্‌টিভ?"

"আজ্ঞে না, তাও নই। আমার চৌদ্দপুরুষে কখনও পুলিসের

ছায়া মাড়ায় নি। আমি বল্‌ছিলাম কি, আপনার নামে আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। আপনার এক পয়সাও লাগবে না; খরচ আমার।"

এতক্ষণে জ্যোতিষী মহাশয়ের সন্দেহ হইল, লোকটা বোধ হয় পাগল। যাহা হউক্, বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনের কথা শুনিয়া তাঁহার একটু কৌতূহলও হইল। আবার তিনি বসিয়া, আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বাবুটি বলিলেন, "আপনি বোধ হয় ভাবছেন, কোথাকার কে তার ঠিক নেই, নিজের খরচে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার উপকার করতে আসে কেন?' বিজ্ঞাপনটির দ্বারায় পরোক্ষভাবে আপনার কিছু উপকার হবে বটে, কিন্তু আসলে সেটি আমারই একটা অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্যে। অত কথায় কায কি, বিজ্ঞাপনটি পড়েই দেখুন না।"—বলিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একখানা হস্তলিখিত কাগজ বাহির করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় টেবিলের দেরাজ টানিয়া তাঁহার চশমাটি বাহির করিয়া চোখে দিলেন। তাহার পর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন—

হিন্দু জ্যোতিষ! ফলিত জ্যোতিষ!

আমি বহুকালাবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া, উভয় প্রণালীর

সমন্বয়সাধনে যত্নবান্ আছি। আমার রিসার্চ্চের (গবেষণার) সুবিধার জন্য জাতি ও বয়স নির্ব্বিশেষে কয়েকজন পস্থিউমস্ চাইল্ড (ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যাঁহাদের পিতৃ-বিয়োগ ঘটিয়াছে) তাঁহাদের শারীর স্থান ও হস্তরেখা পরীক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। আজন্ম পিতৃহীন যে সকল যুবকের চক্ষে এই বিজ্ঞাপনটি পড়িবে, আমার সানুনয় অনুরোধ, দেশীয় তত্ত্ববিদ্যার উন্নতিকল্পে তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্র দ্বারা নিজ নিজ জন্ম-তারিখ-সমন্বিত পারিবারিক ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে আমায় লিখিয়া পাঠান; আমি অবসরক্রমে একে একে তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিব। ইতি—

শ্রীকমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব।
৮নং বেণী দত্তের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া জ্যোতিষী মহাশয় সন্দিগ্ধভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি? আপনার উদ্দেশ্যটা কি?"

বাবুটি বলিলেন, "উদ্দেশ্যটা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? কোনও কারণে একটি লোকের আমি সন্ধান করছি; সে লোকটি আজন্ম পিতৃহীন। কিন্তু কোথায় যে সে আছে, তাও জানিনে, তার নাম কি, তাও জানিনে। তবে পারিবারিক ইতিহাসটুকু পেলেই আমি বুঝতে পার্‌বো, ঠিক সেই লোক কি না।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কেন, তাকে খুঁজছেন কেন?"

"সে কথাটি এখন প্রকাশ করা ঠিক হবে না। যদি সে লোককে পাওয়া যায়, তা হ'লে আপনি তখন সবই জান্‌তে পার্‌বেন। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দিলেই, এই বিজ্ঞাপনটি আমি কয়েকখানি কাগজে ছাপতে দিই। আপনার এতে কিছুই লোকসান নেই, বরং দেশ-বিদেশে নামটা আরও জাহির হয়ে যাবে। বিশেষ, যাঁরা কোনও রকম রিসার্চ্চে প্রবৃত্ত, আজকাল লোকে তাঁদের খুব সম্মানের চক্ষে দেখে। এতে পরোক্ষভাবে, আপনার কাযকর্ম্মের সুবিধাই হবে। বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আচ্ছা, তা যেন হ'ল। সে লোকটিকেই যখন আপনার দরকার, তখন তার পারিবারিক ইতিহাসটুকু দিয়ে, নিজের নামেই বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছেন না কেন?"

বাবুটি বলিলেন, "কেন জানেন? সে লোক যদি এখন বেঁচে না থাকে, অন্য কেউ যদি জাল সেজে এসে তার নাম নিয়ে ঠকাতে চেষ্টা করে, এই জন্যে আর কি! বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমি আরও ৩।৪ লাইন যোগ ক'রে দিতে চাই।"

"কি যোগ কর্‌বেন বলুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় তখন কলম লইয়া, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে যোগ করিয়া দিলেন,—

"নির্ভুল ও অকাট্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার পারিশ্রমিক ১০৲ হইতে ৫০৲ মাত্র। প্রতি দিন প্রাতে সাতটা হইতে দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত নরনারীগণের হস্তরেখা বিচারে ফলাফল বর্ণনা করিয়া থাকি, পারিশ্রমিক ২৲ মাত্র।"

বাবুটি দেখিলেন, ইহা যোগ করিতে হইলে ৩।৪ লাইনের মূল্য বাড়িয়া যায়। তথাপি তিনি স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তা বেশ। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠিপত্র যা আসবে, তা সব রেখে দেবেন, আমি মাঝে এসে সেগুলি দেখে যাব।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান, সেগুলো চাকর দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এখন। আবার কষ্ট ক'রে রোজ রোজ আপনি আস্‌বেন!"

বাবুটি বলিলেন, "না না, কষ্ট কিছুই নয়। চাকর দিয়ে পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখে যাব। আজ হ'ল গিয়ে বুধবার ত? বিজ্ঞাপন বেরুতে, তার জবাব আসতে, অন্ততঃ ৩।৪ দিন লাগ্‌বে। রবিবারে এই সময় আবার আমি আস্‌বো। আচ্ছা, এখন উঠি তবে—প্রণাম।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—"কে লোকটা? নাম-ধাম কিছুই বল্লে না। যাবার সময় প্রণাম ব'লে গেল, তা হ'লে ব্রাহ্মণ নয়। কোনও মন্দ উদ্দেশ্য আছে কি না, তাই বা কে জানে!"

সন্ধ্যা হইল দেখিয়া, সদর বন্ধ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় খট্ খট্ করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

৩

রবিবার দিন যথাসময়ে বাবুটি আসিয়া দর্শন দিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কোন চিঠি আসে নাই জানিয়া, ক্ষুণ্ণমনে তিনি প্রস্থান করিতেছিলেন, জ্যোতিষী আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া, কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। কথার কৌশলে তাঁহার পরিচয়, এবং বিজ্ঞাপন দিয়া লোক খোঁজার উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বাবুটি জ্যোতিষী মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া কহিলেন, "আমার পরিচয় দিলাম না ব'লে, সব কথা খুলে বল্লাম না ব'লে, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা আছে বলেই এ সব কথা এখন প্রকাশ করতে পারছিনে। যদি সে লোককে আমি খুঁজে পাই, তা হ'লে আমার যথাসাধ্য প্রণামী আপনাকে দিয়ে, আপনাকে খুসী করবার চেষ্টা করবো।"

"না না, তার জন্যে আর কি, তার জন্যে আর কি! ওটা একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম বৈ ত নয়। সে যাক্।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। জিনিষ-পত্রের মহার্ঘতা, রাজপথে গুণ্ডার উপদ্রব, "স্বদেশহিতৈষি"গণের ভণ্ডামী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে দুই জনে আলোচনা চলিতে লাগিল।

, কিয়ৎক্ষণ পরে জানালার বাহিরে, "পেনছুট" চুলে টেড়িকাটা, চক্ষু বসা, খালি গা' এক যুবক দেখা দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ইসারায় তাহাকে কি জানাইতেই সে তখনই সেস্থান পরিত্যাগ করিল। আগন্তুক সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি যুবককে দেখিতে পান নাই, বা তাহার প্রতি জ্যোতিষী মহাশয়ের ইঙ্গিতও লক্ষ্য করেন নাই।

অবশেষে সন্ধ্যা হয় দেখিয়া বাবুটি উঠিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে, পশু—পশু বিকেলে আর একবার খবর নিয়ে যাব। এখন আসি তা হ'লে—প্রণাম।"

"জয়োঽস্তু" বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বোক্ত টেড়িকাটা চক্ষু-বসা যুবক, রাস্তার অপর পারে পাণের দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত চোখোচোখি হইতেই সে একটু হাসিল। বাবুটি অল্প দূর অগ্রসর হইলে, জ্যোতিষী মহাশয় একটা ইঙ্গিত করিলেন। সেই যুবক তৎক্ষণাৎ বাবুটির পিছু লইল। জ্যোতিষী মহাশয় দরজা বন্ধ করিয়া উপরে গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই যুবক ফিরিয়া আসিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের সদর দরজার কড়া নাড়িল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠন হস্তে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া যুবককে ভিতরে ডাকিলেন। সে ভিতরে আসিলে, দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে কেব্‌লা, কিছু সন্ধান পেলি?"

যুবকের নাম কেবলরাম। সে দন্তবিস্তার করিয়া হাসিয়া বলিল, “আজ্ঞে, সব সন্ধানই নিয়ে এলাম। আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে, এই কেবলরামের অসাধ্যি কি কিছু আছে?”

“কি সন্ধান পেলি বল্ দেখি!”

কেবলরাম মাথাটি এক ধারে নত করিয়া বলিল, “আজ্ঞে, টাকা দুটো!”

জ্যোতিষী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, “আগে টাকা নিয়ে তবে কথা বল্‌বি? পাড়ার ছেলে তোরা, আমাকে এত অবিশ্বাস?”

কেবল্ বলিল, “হেঁহেঁ অবিশ্বাসের কথা কে বল্‌ছে? তবে আজ টাকা দুটোর বিশেষ প্রিয়জন, ঠাকুর মশায়। আগে রাত ন'টা অবধি খোলা থাকৃত, আজকাল আবার শালারা ৮টা বাজ্‌লেই দোকান বন্ধ ক'রে দেয়। তখন পানওয়ালার দোকান থেকে ডবল দাম দিয়ে জলমিশানো কিন্‌তে হয়। সাতটা বেজে গিয়েছে কি না, তাই বল্‌ছি।”

কেবলরামের এই স্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তি শ্রবণ করিয়া, একটু হাসিয়া, তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কেবলরামের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, “এই ঘরটার মধ্যে আয়।”—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকিলেন।

কেবলরাম টাকা দুইটি টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠনটি টেবিলের উপর

রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "কি কি জেনে এলি বল্ দেখি। খুব আস্তে আস্তে কথা কোস্।"

কেবল তাঁহার অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "তার নাম হরিহর মিত্তির। টল্লি বাড়ীতে চাকরী করে। ১০০৲ মাইনে পায়। শ্যামবাজারে ৩২নং কালু ঘোষের লেনে থাকে। নিজের বাড়ী নয়, ভাড়া বাড়ী। যা যা জান্‌তে চেয়েছিলেন, দেখুন, সবই জেনে এসেছি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক খবর পেয়েছিস্ ত? ভুলটুল হয় নি?"

কেবল বলিল, "আজ্ঞে না, ভুল হবার যো কি? সেই পাড়ার ৩।৪ জন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে এসেছি।"—হঠাৎ কক্ষস্থিত ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় বলিল, "উঃ, সাড়ে সাতটা যে! এখন আসি তবে ঠাকুর মশায়—প্রেণাম।" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিয়া নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তাকে প্রেহার ট্রেহার দিতে হবে কি? তা যদি দরকার হয় ত বল্‌বেন। কিন্তু সে ১০৲ টাকার কমে হবে না, আরও ২।১ জন সঙ্গে নিতে হবে কি না!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "না, সে সব এখন কিছু দরকার নেই।"

"আচ্ছা—যদি দরকার হয় ত পরে জানাবেন। আমরা আপনার হুকুমের চাকর। চল্লুম তবে, প্রেণাম।"—বলিয়া কেবল-দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরদিন অপরাহ্নকালে জ্যোতিষী মহাশয়ের গৃহিণী, চৈতন্য লাইব্রেরীর একখানি উপন্যাস হস্তে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁগা, কাল থেকে দেখছি সর্ব্বদাই তুমি অন্যমনস্ক হয়ে থাক, মনে মনে কি যেন ভাবছ। কি হয়েছে গা?"

জ্যোতিষী মহাশয় প্রথমে তাঁহার চিন্তার বিষয় স্ত্রীকে বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া অবশেষে ব্যাপারটা জানাইতে হইল। শুনিয়া গৃহিণী কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন। শেষে উপন্যাসখানি কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া, তিনি স্বামীর নিকট আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"কি বল দেখি?"

"লোকটি ত এটর্ণি আফিসের বড়বাবু?"

"বড়বাবু কি না, তা জানি নে, ১০০৲ মাইনে পায় তাই শুনেছি।"

"আচ্ছা ধর, যদি এই রকম হয়?"

জ্যোতিষী মহাশয় সোৎসুকে তাঁহার স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী কহিলেন, "মনে কর, এক জন লোক, তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে, অর্থোপার্জ্জনের জন্যে কোনও একটা দূরদেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে কোনও অভাবনীয় উপায়ে, তার বিপুল অর্থলাভ হল। সেই অর্থ নিয়ে সে বাড়ী ফিরছে, পথে তার আসন্ন

কাল উপস্থিত। সে হিসেব করে দেখলে, তার সন্তান তখনও জন্মায় নি। কোনও সাধু বা সচ্চরিত্র বন্ধুলোকের কাছে টাকাগুলি সে গচ্ছিত রেখে বল্লে, আমি ত মরছি, আমার যে সন্তান এখনও তার মাতৃগর্ভে আছে, সে যেন আমার এই টাকাগুলি পায়, তুমি তার ব্যবস্থা কোরো। এই রকম অনুরোধ করে' টাকা গচ্ছিত রেখে, লোকটি মরে গেল। সেই সাধু বা বন্ধুলোক, কার্য্যগতিকে অনেকদিন বাঙ্গালা দেশে আসতে পারেন নি। এখন এসেছেন। এটর্ণি বাবুর সাহায্যে সেই ছেলেকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন। তাকে পেলে, টাকাগুলি তাকে দিয়ে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে যাবেন।"

জ্যোতিষী মহাশয় অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "গিন্নী, কি বুদ্ধি তোমার! অন্ধকারে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু বোধ হচ্ছে, ঠিক যায়গা-টিতে না হোক্, তার অনেকটা কাছাকাছি তুমি পৌঁছেছ। কিন্তু একটা কথা থেকে যাচ্ছে যে!"

"কি কথা?"

"তা হলে সে বন্ধু বা সাধুলোক, ছেলের বাপের নাম কি, তার বাড়ী কোথায়, এ সবই ত জানতো। সেই গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিত। এটর্ণির শরণাপন্ন হবে কেন? হরিহর ত বল্লে, সে কোথায় আছে, তাও তারা জানে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "এত বছরের পরে, সেই বাবুটির নাম, তাঁর গ্রামটির নাম বন্ধু লোক যদি ভুলে গিয়ে থাকেন? সম্ভবতঃ সে

বন্ধুটি নিজে বাঙ্গালী নন, সুতরাং বাঙ্গালীর নাম, বাঙ্গালা গ্রামের নাম মনে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন নয় কি ?"

"তা বটে!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় অবনতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, গৃহিণী বলিলেন, "কিংবা"—বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিংবা কি ?"

"কিংবা ধর, বাঙ্গালা দেশের কোনও রাজা বা জমীদার লোক, অবিবাহিত, ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনও দূর-জিলার পল্লীগ্রামে গিয়ে, স্বজাতীয়া একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে, তাকে বিবাহ করে, কিছুদিন সেইখানেই বাস করছিলেন। ক্রমে জানতে পারলেন, তাঁর স্ত্রীর সন্তানসম্ভাবনা হয়েছে। তখন তিনি মনে ভাবলেন, দেশে ফিরে যাই, আত্মীয়স্বজনকে এ বিবাহের কথা জানাই, তার পর ফিরে এসে স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাব। কিন্তু পথে, কিংবা বাড়ী পৌছেই তাঁর মৃত্যু হল। এ দিকে তাঁর স্ত্রীও জানে না যে, তার স্বামী কে, কোথাকার রাজা বা জমীদার। সুতরাং স্বামী ফিরে না আসতে, সেইখানে প'ড়ে প'ড়েই সে হা হুতাশ করতে থাকলো। এ দিকে বহুকাল পরে সেই রাজা বা জমীদারের ভাই কিংবা ভাইপো, দাদা কিংবা খুড়োর বাক্স থেকে পুরাণো কাগজপত্র বের করে পড়তে পড়তে, আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। তখন সে শিউরে উঠেছে—অ্যাঁ!—কার বিষয় এতদিন আমি ভোগ করছি! সেই গর্ভে দাদার যদি ছেলে হয়ে থাকে, তা হলে সেই ত এই সম্পত্তির মালিক। অথচ সে কাগজপত্র থেকে, দাদার শ্বশুরবাড়ীর

ঠিকানা সে আবিষ্কার করতে পারে নি; তাই কলকাতায় এসে, এটর্ণির শরণাপন্ন হয়েছে, আর এটর্ণি ঐ বিজ্ঞাপণের কৌশল খাটিয়ে তার হেড বাবুকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল।"

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় প্রশংসমান নেত্রে, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, প্রথমে তুমি যেটা বলেছিলে, তার চেয়ে এইটেই যেন বেশী সম্ভব বলে আমার মনে হচ্ছে! কি বুদ্ধি তোমার! এ যেন একেবারে আস্ত উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এত উপন্যাস ত তুমি পড়লে, একখানা লেখ না কেন?"

গৃহিণী মনে মনে খুসী হইয়া, মুখে বলিলেন, "যাও যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। আচ্ছা, তুমিও একটা কিছু ভাবছিলে ত? তুমি কি ভাবছিলে শুনি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমি এটর্ণির কথা শুনে পর্য্যন্ত, একটা উইল-টুইলের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে, তাই ভাবছিলাম।"

গৃহিণী বলিলেন, "একটা উইল-টুইল ঘটিতই হউক, আর যাই হোক্, একটা সম্পত্তির ব্যাপার এর ভিতর আছেই আছে। নইলে দেখছ না, পাছে সে লোক মরে গিয়ে থাকে, আর কেউ জাল সেজে এসে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে এত সাবধান হওয়া দরকার কি? নিশ্চয়ই দশ বিশ লাখ টাকা এর ভিতর আছে।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া গৃহিণী গৃহকার্য্যের জন্য এবং জ্যোতিষী মহাশয় সন্ধ্যা বন্দনার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

মঙ্গলবারে হরিহরবাবু আসিয়া দেখিলেন, একখানি মাত্র পত্র আসিয়াছে। তিনি সেখানি পাঠ করিয়া, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল? এ নয়?"

"না।"

"বিজ্ঞাপনটি চালাচ্চেন ত? কোন্ দেশে সে আছে, তা ত ঠিক নেই। কিছুদিন ধরে বিজ্ঞাপন চল্লে, ক্রমে তার চোখে পড়বেই পড়বে। বিজ্ঞাপনটি আরও কিছু দিন চলুক।"

"হ্যাঁ, তা ত চালাতেই হবে। পর্শু আবার আসবো" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় যে বিজ্ঞাপনটি চালাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহার কারণ, আজন্ম পিতৃহীনের পত্র যত আসুক আর নাই আসুক, এই বিজ্ঞাপনগুলির ফলে কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডার কিছু কিছু আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল তিনি উদয়াস্ত পরিশ্রমে সেগুলি প্রস্তুত করিয়া একে একে ভি-পি করিতেছেন!

বৃহস্পতিবার ডাকে আর একজন আজন্ম পিতৃহীনের পত্র আসিল। পূর্ব্ব পত্রখানি হরিহর বাবু ছিঁড়িয়া ফেলাতে, জ্যোতিষী মহাশয় এই পত্রখানি গোপনে নকল করিয়া লইয়া, মূলপত্র হরিহর বাবুর জন্য রাখিয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া, সে পত্রখানি পাঠ করিয়া হরিহরবাবু অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে ঠিক লোকটি পেয়েছি এবার। এতদিনে আমার চেষ্টা সফল হ'ল।"—বলিয়া ভদ্রলোক, জ্যোতিষী মহাশয়ের

টেবিলের উপর পাঁচ টাকার একখানি নোট প্রণামী স্বরূপ অর্পণ করিয়া, হাসিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় দেরাজের গুপ্তস্থান হইতে নকলটা বাহির করিয়া একবার তাহা পাঠ করিলেন। তার পর, সেখানি হাতে লইয়া উপরে গিয়া, ডাকিলেন, "ওগো, একটা কথা শুনে যাও।"

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইতেই চুপি চুপি বলিলেন, "হরিহর যাকে খুঁজছিল, তার চিঠি এতদিনে এসেছে। এই দেখ।"—বলিয়া নকলখানি তাঁহার হস্তে দিলেন।

পত্রখানি এই :–

বেঙ্গলী মেস—মোরাদপুর
বাঁকীপুর।

মহাশয়,

বিশ্বদূত সংবাদপত্রে আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিলাম। তদুত্তরে লিখিতেছি, আমি আজন্ম পিতৃহীন। আমার পিতা ৺বরদাচরণ ঘোষ মহাশয় সিমলা-শৈলে বড় লাট সাহেবের দপ্তরে চাকরী করিতেন, আমার মাতাঠাকুরাণী নদীয়া জিলায় মুকুন্দপুর গ্রামে আমার মাতুলালয়ে ছিলেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে সিমলা শৈলে জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে আমার পিতৃদেবের দেহান্ত হয়। আমার জন্ম তারিখ জানি না, সন ১৩০০ সাল বৈশাখ মাস, এইটুকুমাত্র জানি। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি মাতৃহীন হই। পরে আমার মাতুল মহাশয় ও মাতুলানী ঠাকুরাণীও স্বর্গারোহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে আমি প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী

স্বর্ণময়ীর আশ্রয়লাভ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িয়া তথা হইতে বি-এ পাস করিয়া, এখন বাঁকীপুরে ৫০৲ বেতনে শিক্ষকতা করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়িতেছি। আমার আত্ম-বিবরণ সংক্ষেপে আপনাকে জানাইলাম। ইতি

বিনীত

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

পত্রখানি গৃহিণী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া, স্বামীকে বলিলেন, "উঃ, দেখ একবার কাণ্ড! ৫০৲ টাকা মাইনের মাষ্টারি কর্‌ছে,—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একটা মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে। একেই বলে অদৃষ্ট!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কিন্তু আমরা যে দুটো অনুমান করেছিলাম, কৈ, তার কোনওটার সঙ্গে ত মিলছে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা, কি করে জানলে মিল্‌ছে না? অবিশ্যি, ঠিক ব্যাপারটা কি হয়েছে তা আমরা জানিনে। ধর, ঐ সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে তার বাপ যদি মস্ত একখানা হীরেই কুড়িয়ে পেয়ে থাকে, যার দাম দশ বিশ লাখ, সেই হীরে হয় ত কারু কাছে গচ্ছিত আছে, সে এখন উত্তরাধিকারীকে খুঁজছে। কিংবা মরবার আগে ওর বাপ হয় ত কোনও রাজা মহারাজার বিশেষ কোন উপকার করেছিল, সেই রাজা, সেই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ কোনও জায়গীর টায়গীর দেবার জন্যে ছেলেকে এখন খুঁজছে। ঠিক কি, তাতো আমরা জানিনে।"

জ্যোতিষী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একটা

বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ তার আছে ব'লে আমারও বিশ্বাস হচ্চে। তা হলে, এখন কি করা যায় বল দেখি?"

"যা পরামর্শ ছিল, তাই কর। আজই রওয়ানা হয়ে তুমি বাঁকীপুরে যাও। তার সঙ্গে দেখা ক'রে, যে রকম বলেছিলে সেই রকম একখানা দলিল তার কাছে লিখিয়ে, কালই রেজিষ্টারি করে নাও। তার পর যা আছে অদৃষ্টে। কি রকম দলিল লেখাবে আর একবার বল দেখি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "লেখাব—আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপন-মূলে এবং আপনার উপদেশে চালিত হইয়া, আমি যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি লাভ করিতে পারিব, তাহার অর্দ্ধাংশ আপনার পারিশ্রমিক ও পরামর্শের মূল্য স্বরূপ, বিনা ওজরে আপনাকে দিতে আমি বাধ্য রহিলাম।—উকীলে সব ঠিক ক'রে লিখে দেবে এখন।"

স্বামীস্ত্রীতে আরও কিছুক্ষণ গোপন পরামর্শ চলিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পঞ্জাব মেলে, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন।

পরদিন প্রাতে, একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় পদব্রজে বাঁকীপুর সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোরাদপুরে গিয়া "বেঙ্গলী মেস" অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রথমে পথচারী কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। অবশেষে এক জন বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি, কাউ-লজ,—আসুন,

দেখিয়ে দিচ্চি।” নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন, মেস বাড়ীটির সম্মুখে খানিকটা খোলা যায়গায় বিস্তর গরু বাঁধা রহিয়াছে। পথপ্রদর্শক বাবুটি বলিলেন, “ঐটিই বেঙ্গলী মেস, তবে ঐ গরুগুলো সামনে থাকার জন্যে লোক এটাকে কাউ-লজ বলে। যান, ঐ দরজা দেখা যাচ্চে।”—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় সাবধানে গরুর ভিড় ঠেলিয়া, সদর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, নিম্নতলের বারান্দায় ২।৩ জন বাবু চলাফেরা করিতেছেন। তখন তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই, সুধীর বাবু এখানে আছেন কি?” বাবুরা বলিলেন, “ছাদে ঐ তেতালার ঘরে আছেন। ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।”

জ্যোতিষী মহাশয় তেতালায় উঠিয়া দেখিলেন, তথায় একখানি মাত্র ঘর, বাকী সমস্ত ছাদ। সুধীর তখন নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইতে যাইবার আয়োজন-স্বরূপ, নিজ তক্তপোষে বসিয়া সিগারেট সেবন করিতেছিল। “বাবাজী, তুমিই সুধীর-কুমার?”—বলিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতবেশী প্রবীণ ভদ্রলোকটিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সুধীর সিগারেটটি লুকাইয়া ফেলিয়া, তক্তপোষ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার কোথা থেকে আসা হচ্চে?”

প্রশ্নের উত্তর দিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, “বাবাজী, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। এ ঘরে কি তুমি একাই থাক?”—বলিয়া কক্ষটির অপর দিকে

চাহিয়া দেখিলেন, আর একখানি তক্তপোষে কম্বলে ঢাকা বিছানা গুটানো রহিয়াছে।

সুধীর বলিল, "আপাততঃ একলা বটে। আর এক জন থাকেন, তিনি সম্প্রতি বাড়ী গেছেন।"

"তোমার ইস্কুল কখন্ ?"

"সাড়ে দশটা থেকে।"

"ল-কলেজ ?"

"বেলা ৪টা থেকে ৫টা।"—বলিয়া সুধীর সবিস্ময়ে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, লোকটিই বা কে, আমার সকল খবর জানিলই বা কোথা হইতে ? বিবাহের ঘটক নাকি ? জিজ্ঞাসা করিল, "মশাইয়ের নামটি কি ?"

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাপু, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, পরে সে সমস্তই জানতে পারবে।"

"আচ্ছা, আপনি বসুন তা হ'লে।"—বলিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিষী মহাশয় তখন সেই তক্তপোষের উপর জাঁকিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধীর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মুখ-হাত ধোবেন ?"

"না, আমি সে সব ইষ্টিশান থেকেই সেরে এসেছি।"

"আপনার স্নানাহার—"

"সেটা, এইখানেই করতে পারলে ভাল হয়। সে সব হবে এখন, ব'স দেখি, সব কথা তোমায় বলি।"

সুধীর উপবেশন করিলে, জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া, একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া বলিলেন, "আমিই কাগজে কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম; আর, তুমি তাই প'ড়ে, আমায় যে পত্রখানি লিখেছিলে, এই তার নকল।"—বলিয়া নকলখানিও সুধীরের হস্তে দিলেন।

দেখিয়া সুধীর বলিল, "ওঃ, বুঝেছি। আপনি হস্তরেখাটেখা দেখতে এসেছেন।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার হাত দেখি, দাও।"

সুধীর হাত বাড়াইয়া দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুতে দিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ মনোযোগের ভান করিয়া সুধীরের করাঙ্ক পরীক্ষা করিলেন; শেষে বলিলেন, "যা গণনা করেছিলাম, ভুল হয় নি, ঠিকই সমস্ত মিলে যাচ্চে।"

সুধীর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মিলে যাচ্চে? প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "না হে না, সে সব কিছু নয়; ও প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য রিসাচ-ফিসাচ নয়, বিজ্ঞাপনের ও সমস্তই বাজে কথা। আসল কথা তোমায় বলি, শোন। আমি গণনায় জানতে পেরেছিলাম যে, সম্প্রতি কোনও আজন্ম পিতৃহীন যুবকের একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ আছে। কিছু ধনরত্ন সে পাবে। সে যুবকটি যে কে, তাই আবিষ্কার করবার জন্তে আমি ঐ বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছিলাম। তোমার জন্ম সন ও মাস

তোমার চিঠিতে পেয়ে বুঝলাম যে, সে ভাগ্যবান যুবা তুমিই। তোমার কর-রেখাতেও সেই কথা মিলে যাচ্চে।"

যুবক বলিল, "তা, কবে আমার সে প্রাপ্তিযোগ ঘটবে? কি পাব?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক কবে, তা' বলতে পারিনে, বাবাজী, তবে অধিক বিলম্ব নেই। আর কত, তাও শাস্ত্রে লেখে না। দশ টাকাও হ'তে পারে, দশ লাখ হতেও আটক্ নেই। তবে, ধনরত্নপ্রাপ্তি যোগটা ধ্রুব। কিন্তু তার জন্যে একটি বিশেষ কষ্টসাধ্য দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক, এবং সে দৈবকর্ম্মটি আমি ছাড়া অপর কারুর দ্বারা হবে না।"

কথাটা শুনিয়া সুধীর কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে তাহার মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

জ্যোতিষী মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজী! ভাবছ, বামনা এই ব'লে ভুজং দিয়ে, দৈবকর্ম্ম করার নাম ক'রে কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার মৎলবে এসেছে? তা নয় বাবাজী! কি মৎলবে আমি এসেছি, তা বলি শোন। আমি কলির ব্রাহ্মণ, লোভটা পুরোমাত্রাতেই আমার আছে; তুমি আমার সহায়তায় যা কিছু ধনরত্ন লাভ করবে, তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে, এই অঙ্গীকার ক'রে যদি তুমি রীতিমত দলিল লিখে রেজেষ্টারি ক'রে দাও, তবেই আমি সেই দৈবকর্ম্মটি করব। নচেৎ নয়। এই জন্যেই গাড়ীভাড়া খরচ করে এত দূর এসেছি। বস্, সমস্ত খোলাখুলি তোমায় বল্লাম।"

সুধীর অবাক্ হইয়া জ্যোতিষীর মুখপানে চাহিয়া রহিল

জ্যোতিষী বলিলেন, "ভেবে দেখ কথাটা। এই যে দলিলের কথা বল্লাম, এর সমস্ত খরচ—ইষ্টাম্পের মূল্য, রেজিষ্টারি খরচা, উকীলের ফী—সমস্ত আমি বহন করব, তোমার এক পয়সা লাগবে না। যদি আমার গণনায় কিছু সত্য না থাকে, দৈবকর্ম্মের কিছু শক্তি না থাকে, তোমার তাতে সিকি পয়সারও লোকসান নেই। যদি থাকে, আমার পারিশ্রমিকস্বরূপ বল, গুণের পুরস্কারস্বরূপ বল, যা পাবে, তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে। যদি ১০টা টাকা পাও, ৫টা আমায় দিও! যদি ১০ লাখ পাও, ৫ লাখ দিও।"

সুধীর বলিল, "পাঁচ লা—খ!"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "কি ছেলেমানুষ তুমি! যখন আমার বিনা সাহায্যে তুমি মোটেই কিছু পাচ্ছ না, তখন তুমি অর্দ্ধেক হোক্, সিকি হোক্, যা পাবে, তাই ত তোমার লাভ। কথাটা ভেবে দেখ।"

সুধীর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল ; শেষে বলিল, "আচ্ছা, টাকা যা পাব, তার অর্দ্ধেক না হয় আপনাকে দিলাম। আপনি বলেছেন ধনরত্ন। যদি একটি রত্ন পাই, তার অর্দ্ধেক আপনাকে ভেঙ্গে কি ক'রে দেবো?"

"তার উচিত মূল্যের অর্দ্ধেক আমায় দেবে। সে সব কথা দলিলে স্পষ্ট করেই লেখা থাকবে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া কোথায় হবে?"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "যে কোনও একজন ভাল উকীলের বাড়ীতে। বড় রাস্তার মোড়ে যে এক জন বাঙ্গালী উকীলের সাইনবোর্ট দেখে এলাম, উনি কেমন?"

সুধীর বলিল, "কেশব বাবু? ভাল উকীল।"

"তবে, বাবাজী, যদি রাজি থাক, এখনই ওঠ। চল, কেশব বাবুর বাড়ী যাই। আর বিলম্ব নয়। রাজি না থাক, বল, আমি বিদায় হই।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলুন, আমি রাজি।"

এই সময় ভৃত্য সুধীরের চায়ের পেয়ালা হস্তে প্রবেশ করিল। সুধীর মুখ পুড়াইয়া সেই গরম চা এক নিশ্বাসে পান করিয়া লইয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত উকীলবাড়ী গেল।

সেই দিন অপরাহ্নের ট্রেণে, রেজিষ্টারি দলিলখানি ব্যাগে ভরিয়া জ্যোতিষী মহাশয় কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময়, সুধীরকে নিজ যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়া লইলেন যে, প্রাপ্তিযোগটি সফল হইবামাত্র সে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে সে সংবাদ প্রদান করিবে।

৭

কলিকাতায় ফিরিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় গৃহিণীকে সকল সংবাদ জানাইলেন এবং আশান্বিত হৃদয়ে উভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ কাটিল, পক্ষকাল কাটিল, কিন্তু সুধীরের নিকট হইতে কোনও প্রকারের সংবাদ নাই। এ দিকে এটর্ণিরা তাহাকে লইয়া কি করিল না করিল, তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই।

তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় পুনরায় বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। বেঙ্গলী মেসে গিয়া শুনিলেন, সপ্তাহখানেক হইল, ইস্কুলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়া সুধীর চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যাইতেছে, তাহা কাহাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কর্ত্তা-গৃহিণীতে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে রাজা জায়গির দিবে, সেই রাজার নিকটেই সুধীর বোধ হয় গমন করিয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, "শেষে কি ফাঁকি দেবে আমাদের?"

জ্যোতিষী বিমর্ষভাবে বলিলেন, "পৈতে ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছি, ফাঁকি দেন, নরকে প'চে মর্‌বেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাতে ত আমাদের ভারি লাভ! আচ্ছা, এই দু'বার বাঁকীপুর যাতায়াতে, দলিল-টলিলে, কত খরচ হ'ল?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "সেই হিসেবই সে দিন দেখছিলাম। ৪০৷৷০ খরচ হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ ৪০৷৷০ টাকাই জলে গেল!"

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। সে দিনও অপরাহ্ণে জ্যোতিষী মহাশয় দ্বিতলের সেই কক্ষটিতে বসিয়া আপন মনে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উঠিল—"জ্যোতিষী মশায়! জ্যোতিষী মশায়!"

বারান্দায় গিয়া চিক ফাঁক করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন —সুধীর। কিন্তু সে নিজস্ব মোটরগাড়ীতে বা ল্যাণ্ডো হাঁকাইয়া আসে নাই—সাধারণ গৃহস্থের সাজে পদব্রজে আসিয়াছে, দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের বুকটা দমিয়া গেল।

জ্যোতিষী মহাশয় ভগ্নমনে নামিয়া গেলেন; দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "এই যে সুধীর বাবাজী, এত দিনে মনে পড়ল? এস এস, ভিতরে এস।"—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন।

সুধীর তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার কৃপায়, ধনরত্ন আমি লাভ করেছি। আমার সর্ত্ত অনুসারে, তার অর্দ্ধভাগ আপনাকে আমি দেবো ব'লে ডাকৃতে এসেছি।"

যুবকের অঙ্গে লক্ষপতির পোষাক না থাকিলেও, তাহার মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের একটু ভরসা হইল। ভাবিলেন, 'লাখ-লিখ' না হউক, তবু বোধ হয়, বেশ ভাল রকমই কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়াছে। নিজে বসিয়া, সুধীরকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমটা কি হ'ল, সব বল দেখি বাবাজী!"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ্ঞে আগে কিছু বল্‌বো না; —আমার সঙ্গে আসুন, একবারে দেখাব। আপনাকে নিতে এসেছি, চলুন।"

জোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দূর?"

"কাছে। শ্যামবাজার।"

"আচ্ছা, ব'স বাবা, আমি কাপড় বদলে আসি।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। কি ধনরত্ন সুধীর লাভ

করিয়াছে, যাহার অর্দ্ধেক তিনি এখনই পাইবেন, জানিবার জন্ত ব্রাহ্মণ এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীকে সংবাদটা জানাইয়া আসিবারও অবসর হইল না।

যুবকের সহিত শ্যামবাজারে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, ইহা ত সেই হরিহর মিত্রেরই ঠিকানা—৩২ নং কালু ঘোষের লেন!

সুধীর, বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে বসাইয়া, পার্শ্বদ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া সুধীর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জ্যোতিষী মশায়, আপনার কৃপায় আমি নগদ ১০১টি টাকা পেয়েছি। এই নিন আপনার ভাগ।"—বলিয়া দশ টাকার পাঁচখানি নোট এবং একটি রূপার আধুলি সে জ্যোতিষী মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিয়া, বলিল, "নগদ এই। আর পেয়েছি, একটি রত্ন। ওগো, এস।"

বলিতেই—পর্দ্দা সরাইয়া, ১৪।১৫ বৎসরের একটি সুন্দরী মেয়ে, একখানি আসমানী রঙের শাড়ী পরিয়া, সভয়-পদক্ষেপে অবনত-বদনে প্রবেশ করিল। সুধীর, হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আর—এই স্ত্রীরত্ন।"—বলিয়া যুগলে জ্যোতিষী মহাশয়কে প্রণাম করিল। তাহার পর, হাসিতে হাসিতে বলিল—"রত্ন অবিভাজ্য। মূল্যের অর্দ্ধাংশ আপনার প্রাপ্য হ'লেও, কোনও উপায় নেই—কারণ, আমার এ রত্নটি অ-মূল্য।" বলিয়া সুধীর হাসিতে লাগিল।

জ্যোতিষী মহাশয় মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া

লইলেন। সুধীরের দেওয়া পাঁচখানি নোট হইতে একখানি তুলিয়া লইয়া, মেয়েটির হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। মেয়েটি কার হে সুধীর?"

বধূকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিয়া, সুধীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, "এটি হরিহর বাবুরই মেয়ে। হয়েছে কি জানেন? আমার বাবা, আর হরিহর বাবু, এঁরা বাল্যবন্ধু ছিলেন; একসঙ্গে পড়তেন। তাঁরা পঠদ্দশাতেই আমোদ করে পরস্পর বেহাই সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। আমি যখন মাতৃগর্ভে, তখনও বাবা সিমলা থেকে হরিহর বাবুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'আমার যদি ছেলে [illegible]বে সে তোমার জামাই হয়ে রইল।' তাহার পর বাবা ত মারা গেলেন। হরিহর বাবু প্রথম প্রথম আমার মা'র খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, তার পর সে সব আর হয়নি। ক্রমে তাঁর ছেলে-মেয়ে হ'তে লাগ্‌লো। ১০০৲ টাকা মাইনের চাকরী, কলকাতা সহরের খরচ, বুঝ্‌তেই ত পারছেন। তার উপর, এর পূর্ব্বে দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন—এইটি তৃতীয় এবং শেষ মেয়েও। মেয়েটি বড় হ'ল। মনের মত পাত্রের দর ওঠে ৫ হাজার—১০ হাজার। অথচ এ দিকে একটি পয়সা সঞ্চয় নেই। তখন সেই বাল্য ও যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়ল। আমি যদি বেঁচে থাকি, কোথায় আছি, তা জানেন না, তাও বটে, আর লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে আছি, না চোর-গুণ্ডা হয়েছি, তাও জানেন না, তাই ঐ কৌশল ক'রে আপনার নামে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন।

আপনি বাঁকীপুর থেকে চ'লে আসবার পরের রবিবারে, হরিহর বাবু আমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত। সব কথা আমায় ভেঙ্গে বল্লেন, বাবার চিঠিপত্র আমায় দেখালেন। পিতৃ-আজ্ঞা—আমি পালন করতে প্রস্তুত আছি জেনে বল্লেন—'বাবাজী, তবে এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চল। সেখানে ল-কলেজে ভর্ত্তি হবে, এবং আমি যে এটর্ণি বাবুদের বাড়ী চাকরী করি, সেখানে তোমায় আর্টিকেল করিয়ে দেবো, আমি বাবুদের ব'লে রেখেছি। সেই আফিসে তুমি কায-কর্ম্মও করবে, পকেট খরচ স্বরূপ গোটা ৫০ টাকা বাবুরা তোমায় দেবেন, স্বীকার করেছেন।'—এই কথা শুনে, [illegible] চাকরী ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলাম। এই এক হ'প্তা হল বিবাহ হয়েছে।"

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় মৌখিক সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি উঠিলেন। নোটগুলা ও আধুলিটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। বলিলেন, "বাবাজী, টাকা-গুলো তুলে রাখ।"

সুধীর বলিল, "সে কি জ্যোতিষী মশায়! টাকা রেখে যাচ্ছেন কেন? আপনার ভাগের টাকা ব'লে রহস্য করেছি বৈ ত নয়! ঐ টাকা দিয়ে আমরা দুজনে আপনাকে প্রণাম করেছি! নিন্—নিন্।"—বলিয়া সুধীর নোটগুলি জ্যোতিষী মহাশয়ের পকেটে ফেলিয়া দিল।

"আচ্ছা, তবে তাই!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয়, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।